স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
৭ম বর্ষ ❑ পঞ্চম সংখ্যা ❑ জুন-জুলাই ২০১৮

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ
ডা. জয়ন্ত দাস

সম্পাদকমণ্ডলী
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় ❑ ডা. কুশল সেন

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা.অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা.আশীষ কুমার কুণ্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা.দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা.শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা.সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ মনোজ দে, গোপাল সরকার,
ডা. কুশল সেন,
দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
গোপাল সরকার
স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র তরফে
দাসপাড়া (আংশিক), পূর্ব বুড়িখালি, বাউরিয়া
উলুবেড়িয়া
হাওড়া ৭১১৩১০

মুখ্য পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০০১৬
ফোন: ৪০৬৪-৪০৯৭/৪১০৩

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

ঘুম

ঘুম কী আর কত রকমের? ঘুম না হওয়াই বা কী? ঘুম না এলে কী করেন? ভেড়া গোনেন? অন্য কিছু করার আছে কিনা, ভেবে দেখেছেন? বই পড়া? সিগারেট? মদ? ঘাড়ে মাথায় জল ঢালা? নাঃ, আরেকটু করার আছে যে! লিখেছেন **ডা. সুমিত দাশ**। ৪

ভয়ংকর ভবিষ্যৎ

টিবি-র জীবাণু ওষুধে মরছে না। অনেকগুলো ওষুধ একসাথে দিয়েও মরছে না। আমরা মরছি, দলে দলে। এটা নিয়ে আমাদের কি কিচ্ছু করার নেই? যা করবেন ওই ডাক্তাররা? আমরা অর্ধেক ওষুধ খাব, তারপর রোগ ছড়াব, হেঁচে-কেশে-কথা বলে?
লিখেছেন **ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত**। ৭

নাগরিক সুস্থতায় সমাজের ভূমিকা

বাচ্চা খেলে না কেন? পার্ক নেই, খেলার সাথি নেই। আমরা ভেবেছি আট বছরের বাচ্চা হোমটাস্কে মুখ ডুবে থাকলে আমার সুখ, তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আর সেই বাচ্চা যখন ত্রিশ বছরে পৌঁছে ডায়াবেটিস আর হার্টের অসুখে ভোগে, আমরাই অবাক হই, গালাগালি দিই একে-ওকে-তাকে। কিছু কি করার নেই? লিখেছেন **ডা. গৌতম মিস্ত্রী**। ১১

মাসিকের ব্যথা—জানা অজানা কিছু দিক

মেয়েদের ঋতুস্রাব বা মাসিকের সময় কমবেশি ব্যথা হয়। মোটামুটি অর্ধেক মেয়ের জীবনের কোনো-না-কোনো সময়ে মাসিকের ব্যথায় বাড়াবাড়ি রকমের কষ্ট পান। অথচ এ-নিয়ে আলোচনা করা মুশকিল, তাই চিকিৎসা পান কম মহিলাই। এই ব্যথার চিকিৎসা নিয়ে প্রাথমিক কথাগুলো বলেছেন **ডা. অনিন্দিতা দাস**। ৩০

চিকিৎসাব্যবস্থার সংকট

যেটুকু সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা ছিল, সরকার ক্রমে ক্রমে সেটাও তুলে দিচ্ছেন। সরাসরি সে কথা মানুষকে জানালে ভোটবাক্সে টান পড়ে, তাই বলা হচ্ছে, সরকারি ব্যবস্থা খুবই ভালো, কিন্তু ডাক্তার আর চিকিৎসাকর্মীদের লোভ, দুর্নীতি আর অপদার্থতার ফলে মানুষ ভুগছেন। ডাক্তারদের কোনো দোষ নেই, এমন নয়। কিন্তু সরকারি প্রবল প্রচারে ডাক্তার আর চিকিৎসাকর্মীদের ওপর নির্বিচার আক্রমণ নামছে। আতঙ্কগ্রস্ত ডাক্তারের হাতে সুচিকিৎসা আরও বিপন্ন হচ্ছে।
লিখেছেন **ডা. বিষাণ বসু**। ৪৭

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত লেখা জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। এইসব লেখা পড়ে কেউ নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করবেন না, করলে সেই চিকিৎসার ফলে যে অসুবিধা বা বিপদ ঘটতে পারে, তার দায় সম্পূর্ণভাবে সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* সেজন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়		৩
ঘুম	ডা. সুমিত দাশ	৪
ভয়ংকর ভবিষ্যৎ	ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত	৭
নাগরিক সুস্থতায় সমাজের ভূমিকা	ডা. গৌতম মিস্ত্রী	১১
খেলা ও মানসিক স্বাস্থ্য	রুমঝুম ভট্টাচার্য্য	১৫
নিঃসঙ্গ মৃত্যু	রুমঝুম ভট্টাচার্য্য	১৭
রাজার অসুখ	ডা. অপূর্ব	১৯
এক ডাক্তার ও এক যোগী	অহনা মল্লিক	২২
সেবাব্রতী চিকিৎসক, আইনের মারপ্যাঁচ, ও আত্মঘাতী ঔদাসীন্য	ডা. জয়ন্ত দাস	২৬
কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন		২৯
মাসিকের ব্যথা—জানা-অজানা কিছু দিক	ডা. অনিন্দিতা দাস	৩০
ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে	প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়	৩৩
বিসিজি টিকায় যক্ষ্মা হওয়া আটকায় না, তবু এ টিকা লাগাব কেন?	ডা. পুণ্যব্রত গুণ	৩৮
হরেকরকম		
বাচ্চাদের দাঁত ওঠার সময়		৪০
প্যাসিভ স্মোকিং কী? তা কি ক্ষতিকারক?		৪১
ডিহাইড্রেশন বা জলশূন্যতা		৪২
আপনি আপনার খাবারের সঙ্গে প্রতিদিন ১০০ প্লাসটিকের টুকরো খাচ্ছেন না তো?		৪৩
কর বসিয়ে জীবনশৈলীজনিত রোগ আটকানো যায় কি?		৪৩
ডাক্তাররাও ভেবে দেখুন	বোলান গঙ্গোপাধ্যায়	৪৪
চিকিৎসাব্যবস্থার সংকট	ডা. বিষাণ বসু	৪৭
দেশবিদেশের বস্তিজীবন ও স্বাস্থ্য সমস্যা	ধ্রুবজ্যোতি দে	৪৯
চিঠি		৫৬
মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প		৫৬

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল

পাতিরাম
বুকমার্ক
পিপলস বুক সোসাইটি
বই-চিত্র
মনীষা গ্রন্থালয়
নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট

কলকাতার অন্যত্র

অমর কোলে-র স্টল (বিবাদি বাগ)
এস কে বুকস (উল্টোডাঙা)
লেখনী, ২/৪৬ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭
কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়)
বইকল্প (ঢাকুরিয়া)
দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি (উত্তর কলকাতা)
জ্ঞানের আলো (যাদবপুর, কলকাতা ৩২)

কলকাতার বাইরে

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল)
ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ)
জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি, ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮)
প্রয়াস মল্লভুম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৩৪২২৭৪৯৯)
মাধব পেপার স্টল (বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড, ফোন ৯৯৩২৫৫২৪৪)
প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিং, ফোন ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২)
আনন্দম (মাথাভাঙা, বরুণ সাহা, ফোন ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮, ৯৭৩৩১১৬৪৪২)
সোমা দত্ত (হাওড়া, ফোন ৯১৪৩২৪৫৯৩৭)
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি (বাগনান, ফোন ৯৮৩০৬০৩০২৯)
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি (রাধানগর শাখা, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৭৪৫৬৫০৪৭)

শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের বই-এর স্টলে।

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭

পত্রিকা পাওয়ার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৮৮৬৪৪১, ৯৪৭৭০২৮১৫৭

ইমেল: swasthyerbritte@gmail.com

স্বাস্থ্যের বৃত্তের গ্রাহক হোন।

সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।

Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়-
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭
আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন

অথবা

NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে
Swasthyer Britto
A/c No. 0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFSC Code: CNRB0000315

সেদিনই NEFT Transaction Id ও গ্রাহকের নাম-ঠিকানা, ফোন বা SMS করে জানান এই নম্বরে ৯৮৩০৮৮৬৪৪১

সম্পাদকীয়

ডা. রাতুল বন্দ্যোপাধ্যায় আর ডা. কাফীল খান। একজন এই পশ্চিমবঙ্গের, আরেকজন উত্তরপ্রদেশের। দু-জনকেই পুলিশে গ্রেপ্তার করেছে। দু-জনেরই মূল 'অপরাধ' একই।

ডা. কাফীল খান গোরখপুরের যে হাসপাতালে কাজ করতেন, সেখানে অক্সিজেন ফুরিয়ে যাবার ফলে শিশুগুলি মারা যাচ্ছিল। নিজের বাড়িতে ছুটি কাটানো মুলতুবি রেখে দিনরাত দৌড়ঝাঁপ করে গাঁটের কড়ি খরচ করে অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনে এনেছেন ডা. কাফীল। তাতে অনেক শিশু বেঁচে গেছে বটে, কিন্তু মুখ পুড়েছে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের। অতএব তিনি উদ্যোগ নিয়ে ডা. কাফীলকে জেলে পোরার ব্যবস্থা করেছেন। নানা সাজানো কেসে আটমাস ধরে বন্দি থেকে গতমাসে সবে জামিন পেয়েছেন কাফীল। তাঁর ওপর অজস্র গুরুতর অভিযোগ, আর যেসব বড়ো আমলার জন্য হাসপাতালে অক্সিজেন বন্ধ হয়ে গেল, তাঁরাই সরকারের নিজের লোক। এই নিয়ে দেশজোড়া প্রতিবাদ চলছে।

অন্যদিকে, আমাদের কলকাতার কাছেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটি জায়গা ভাঙ্গড়। সেখানে ভাঙ্গড়ে সরকার চাষিদের জমি নিয়ে 'পাওয়ার গ্রিড' বানানোর চেষ্টা করছিলেন, আর চাষিরা সেই জমি দিতে চাননি। নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরে ঠিক এমন ঘটনাই ঘটেছিল আগের সরকারের আমলে; বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দল তখন চাষিদের পক্ষে ছিলেন। অনিচ্ছুক্ চাষিরা, নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরের মতোই, ভাঙ্গড়ে সরকার ও শাসক দলের বাহিনীর আক্রমণে নাজেহাল। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সমস্ত সুযোগ তাঁদের হাতের বাইরে। একজন ডাক্তার হিসেবে রাতুল তাঁদের চিকিৎসার কাজটি করেছিলেন, যেমন ছাত্রাবস্থা থেকে তিনি বন্যা বা ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত নিরুপায় মানুষের জন্যও করেছিলেন। তাঁকে মাঝরাত্রিতে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ। ইউএপিএ বলে একটা আইন হয়েছে, সেই আইনের ঘোষিত উদ্দেশ্য হল সন্ত্রাসবাদ ঠেকানো। রাতুল নাকি সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম করছিলেন! তিনি এখনও জেলে!

একজন ডাক্তারি ছাত্র চিকিৎসক হিসেবে ছাড়পত্র পাওয়ার আগে শপথ নেন, "আমি আমার কর্তব্য ও আমার রোগীদের মাঝখানে ধর্ম, জাতীয়তা, জাতি, দলগত রাজনীতি ও সামাজিক অবস্থানের বিবেচনাকে আসতে দেব না"। অসুস্থের জাত নেই। অসুস্থ মানুষ যদি শত্রু হয়, যদি হয় যুদ্ধে অন্যপক্ষের সৈনিক, তাহলেও ডাক্তারের চিকিৎসার হাত থেমে থাকে না। সেই কতদিন আগে, ১৮৬৪ সালে, এমনকী মহাশক্তিশালী রাষ্ট্রও মেনে নিয়েছিল, ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করতে পারবেন, যেকোনো পক্ষের আহতদের সেবা করাই তাঁদের দায়িত্ব। রাতুল বা কাফীল খান সেই কাজটাই করছিলেন।

এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, সবাই মাঝেমধ্যেই ভাষণে বলেন, ডাক্তারদের নিজের কথা না ভেবে মানুষের সেবা করতে হবে। মানুষের সেবা করতে গেলে তাঁরাই যে আবার ডাক্তারকে জেলে পাঠাবেন নানা মিথ্যা অজুহাতে, সেটা অবশ্য তাঁরা বলেন না!

আর জনগণই বা কেমন ডাক্তার চান? প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা ডাক্তার থেকে সরকারি চাকরি করা ডাক্তার—সবার ওপর জনরোষ প্রচ্ছন্ন থেকে এখন প্রকট হয়েছে। কথায় কথায় ডাক্তারের ওপর হামলা হচ্ছে, অভিযোগ—তাঁদের সেবার মনোভাব নেই। কিন্তু যেসব ডাক্তার রাতুল বা কাফীল খানের মতো নিজের স্বার্থ তুচ্ছ করে মানুষের সেবায় এগিয়ে আসছেন, তাঁদের প্রতি জনগণ কতটা শ্রদ্ধাশীল? তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে, তাঁদের ভালো কাজ করার প্রচেষ্টায় সমর্থন নিয়ে, এগিয়ে আসছেন কি?

ডাক্তাররা কোনো মঙ্গলগ্রহের জীব নন। মানুষ যতদূর এগোবেন, তাঁরাও ততদূরই নিঃস্বার্থ সেবা করতে পারবেন। আপনিই ভাবুন কী করবেন।

ঘুম

ডা. সুমিত দাশ

ঘুম না এলে কী করেন? ভেড়া গুনি। তার মানে? একপাল ভেড়া ভেবে নিয়ে, এক-দুই-তিন . . . হাজার। তারপর ঠিক গুনলাম কিনা বোঝার জন্য হাজার নশো নিরানব্বই, নশো আটানব্বই . . . এভাবে উলটে দিয়ে গুনি।

তাতে ঘুম আসে?

কোনোদিন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। কোনোদিন ক্লান্তই হই, ঘুম আর আসে না। ঘুম না এলে যে যার মতো করে এরকম নানা পদ্ধতি অনুসরণ করেন। কেউ টিভি দেখেন, কেউ বই পড়েন। কেউ সিগারেট খান, কেউ মদ খান। কেউ শুধু ঘড়ি দেখেন আর ঘাড়ে মাথায় জল দেন। তাও ঘুম আর আসে না।

ঘুম কী, ঘুম না হওয়াই বা কী আর ঘুম না হলে কী কী করা যায় সেগুলো একটু দেখে নেওয়া যাক।

ঘুম কত রকমের

শারীরবৃত্তীয়ভাবে ঘুম দু-রকমের। ১. নন র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট (NREM) ঘুম এবং ২. র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট (REM) ঘুম। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এক ধরনের ঘুমে চোখের নড়াচড়া দ্রুত হয় আর এক ধরনের ঘুমে চোখের নড়াচড়া হয় না। এছাড়া মানুষের শরীরের আরও কিছু পরিবর্তন এই দু-ধরনের ঘুমের মধ্যে আসে।

NREM স্লিপে চারটে ধাপ বা স্টেজ আছে। তার মধ্যে সবথেকে গভীর ঘুম হয় তিন আর চার নম্বর স্টেজে। NREM স্লিপে মানুষের রক্তচাপ, শ্বাসের গতি, নাড়ির গতি সব কমে যায়। অর্থাৎ বোঝা যায় মানুষটি শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। তবে হঠাৎ করে সারা দেহ আন্দোলিত হয়ে উঠতে পারে। চার নম্বর ধাপের ঘুম ঠিকঠাক না হলে ঘুমের মধ্যে প্রস্রাব করে ফেলা, ঘুমের মধ্যে হাঁটা বা দুঃস্বপ্ন দেখা—এসব হতে পারে।

REM স্লিপের সঙ্গে শারীরবৃত্তীয়ভাবে জেগে থাকার বিশেষ পার্থক্য নেই। অর্থাৎ রক্তচাপ, নাড়ির গতি, শ্বাসের গতি NREM-এর তুলনায় অনেক বেশি থাকে, কিছু ক্ষেত্রে জেগে থাকার থেকেও বেশি হয়। সেই জন্যে একে প্যারাডক্সিক্যাল (paradoxical) স্লিপও বলে। দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ সরীসৃপের মতো হয়ে যায়, অর্থাৎ বাইরের তাপমাত্রার সঙ্গে দেহের তাপমাত্রা পরিবর্তন হয়। শরীর কখনো কেঁপে বা ঘাম দিয়ে বাইরের তাপমাত্রার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে। দেহের সমস্ত পেশি শিথিল হয়ে যায়। তবে পুরুষ মানুষেরর লিঙ্গ উত্থিত হয়ে যায় REM স্লিপে। এরকম হলে প্রমাণ হয় তার লিঙ্গোত্থানজনিত সমস্যা, যাকে চলতি কথায় বলে 'ধ্বজভঙ্গ', তা নেই, বা থাকলেও সেই সমস্যার শারীরবৃত্তীয় কোনো গুরুতর কারণ নেই।

মানুষ প্রথমে NREM স্লিপের চার ধাপ পেরিয়ে REM স্লিপে যায়। দেখা গেছে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশে স্টেজ-৪ বা গভীর ঘুম সবথেকে বেশি হয়। আর রাতের শেষ তৃতীয়াংশে REM স্লিপ বেশি হয়। ঘুম

. . . ঘুম না এলে টিভি দেখা চলবে না। রাতে খুব ভারী খাবার চলবে না। ঘুমানোর আগে চা/কফি চলবে না। ঘুম না এলে সিগারেট খাওয়া চলবে না। মদ খাওয়া যাবে না।

শুরুর সাধারণত প্রথম ৯০ মিনিট বাদে প্রথম REM স্লিপ শুরু হয়। প্রথমে ১০ মিনিট থাকে, পরে ১৫ থেকে ৪০ মিনিট থাকে। স্বপ্ন দু-ধরনের ঘুমেই আসে। REM-এ স্বপ্নে একটা ঘটনা বা তার উদ্দেশ্য অনেক পরিষ্কার থাকে।

ঘুমকে নিয়ন্ত্রণ করে বেশ কিছু কেমিক্যাল। এর মধ্যে অ্যাসিটাইল কোলিন REM স্লিপে সাহায্য করে। অপরদিকে ডোপামিন জাগিয়ে রাখে। পিনিয়াল গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত মেলাটনিন ঘুম পাড়াতে সাহায্য করে।

কেন আমরা ঘুমাই

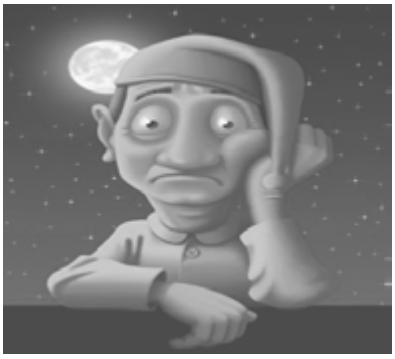

নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখা গেছে শরীরকে সুস্থির রাখতে ঘুমের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ খাটাখাটনিতে শরীরে যে ক্ষতি হয় তা মেরামতিতে ঘুম সাহায্য করে। শরীরের তাপমাত্রা ও শক্তি নিয়ন্ত্রণে প্রতিদিন ঘুমের প্রয়োজন ৬-৯ ঘণ্টা। ৬ ঘণ্টার কম যারা ঘুমায় তাদের শর্ট স্লিপার বলে এবং ৯ ঘণ্টার বেশি সময় যার ঘুমায় তাদের লং স্লিপার বলে। শর্ট স্লিপাররা সাধারণত সামাজিকভাবে সক্রিয় এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়। লং স্লিপাররা একটু চুপচাপ এবং হতাশাগ্রস্ত হয়।

অনিদ্রা রোগ বা ইনসমনিয়া (Insomnia)

ঘুম সম্পর্কিত যতরকম সমস্যা আছে তার মধ্যে ইনসমনিয়া (Insomnia) বা অনিদ্রা—এই উপসর্গ নিয়ে সবথেকে বেশি মানুষ আসে। অনিদ্রাকে তিন ভাগে ব্যাখ্যা করা যায়। নিদ্রা শুরু হতে দেরি হওয়ার সমস্যা, নিদ্রা ধরে রাখার সমস্যা, খুব তাড়াতাড়ি নিদ্রাভঙ্গের সমস্যা। এই তিন ধরনের সমস্যাই সবার থাকবে এরকম নয়।

সাধারণভাবে অল্প কয়েকদিনের নিদ্রাহীনতার সমস্যা কম বেশি সবারই হয়। পরীক্ষার আগে বা চাকরির ইন্টারভিউয়ের আগে এরকম হয়। কিছু ক্ষেত্রে নিকটাত্মীয় বিয়োগে ঘুমের সমস্যা হয়। এগুলোর চিকিৎসা বিশেষ দরকার হয় না। খুব কম দিনের জন্যে ঘুমের ওষুধ অনেক সময় দেওয়া হয়।

কিছু মানুষের দীর্ঘমেয়াদি ঘুমের সমস্যা থাকে। সেটাই এখানে মূল আলোচ্য। এদের মূল অভিযোগই হচ্ছে ঘুম না হওয়া আর সেটাই এদের ডাক্তারের কাছে আসার কারণ। এই অনিদ্রাও নানা রকমের হয়।

এক ধরনের অনিদ্রা রোগ আছে যাকে বলা হয় মন-শারীরবৃত্তীয় অনিদ্রা রোগ বা সাইকোফিজিওলজিক্যাল ইনসমনিয়া (Psychophysiological Insomnia)। এক্ষেত্রে রোগী বলেন যে তার বছরের পর বছর ঘুম হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে বিছানা দেখলেই তাদের ঘুম উঠে যায়। এবং নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় অন্য বিছানায় তাদের ঘুম এসে যায়। বিছানায় শুলে শরীর শিথিল হওয়ার বদলে বিভিন্ন পেশি টেনসড বা শক্ত হয়ে যায়। যেমন ঘাড় পিঠ হাত পায়ের পেশি। এছাড়া বিছানায় শুলে অনেকের মাথা ব্যথা বুক ধড়ফড়ানিও হয়। অধিকাংশ মানুষ রাতে না ঘুমিয়েও দিনে তাদের নির্দিষ্ট কাজ করে ফেলেন। তবে কেউ কেউ দিনের শেষে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন। এই ঘুমের সমস্যার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে আরও কিছু সমস্যা জড়িত থাকে। যেমন উদ্‌বেগ রোগ, হঠাৎ ঘুমের ওষুধ বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি।

অনেক সময় ঘুম না হওয়াটাই একমাত্র সমস্যা হয়। এই অনিদ্রার সঙ্গে উপরে উল্লিখিত কোনো সমস্যা থাকে না। আর এই অনিদ্রার সঙ্গে অন্য কোনো কারণ অর্থাৎ উদ্‌বেগ বা অবসাদ রোগ বা হঠাৎ ঘুমের ওষুধ বন্ধ করে দেওয়া এসব থাকে না, সেই জন্যে এই ধরনের অনিদ্রাকে প্রাইমারি ইনসমনিয়া বলে।

মানসিক রোগ নির্ণয় ও নামকরণ করা হয় যে নির্দেশিকা অনুযায়ী সেই DSM-5 বলেছে অনিদ্রা রোগ তখনই ডায়াগনোসিস করা যাবে যদি কোনো মানুষের সপ্তাহে অন্তত তিন দিন ঘুমের সমস্যা হয় এবং সেটা অন্তত তিন মাস ধরে চলতে থাকে।

অনিদ্রার চিকিৎসা

চিকিৎসা দু-ভাবে হয়। ১. ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা ২. ওষুধ ছাড়া চিকিৎসা।

১. ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা: খুব দ্রুত ঘুমের সমস্যা সমাধানের জন্য ওষুধের কোনো বিকল্প নেই। সাধারণত বেনজোডায়াজেপিন গ্রুপের ওষুধ বেশি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া জলপিডেম, এসজোপিক্লোন এবং জেলিপ্লোন ঘুমের ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই ওষুধগুলি ডাক্তারি পরামর্শ ছাড়া খাওয়া উচিত নয়।

২. ওষুধ ছাড়া চিকিৎসা: অনিদ্রা রোগ ওষুধ ছাড়াও নানাভাবে চিকিৎসা হয়। আমরা তার কিছু সংক্ষেপে দেখে নেব।

ক. স্লিপ হাইজিন (Sleep hygeine) অর্থাৎ ঘুমানোর জন্যে যে স্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলি করা দরকার, দেখা গেছে জীবনযাপন প্রণালীর গলদের জন্যে মানুষের ঘুমের সমস্যা হয়। এই আচরণগুলির পরিবর্তন করলে অনেক ক্ষেত্রেই ঘুমের সমস্যার সমাধান হয়। তবে একসঙ্গে অনেকগুলি আচরণকে লক্ষ না করে রোগীর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে একটি বা দু-টি আচরণের পরিবর্তনের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করলে এই পদ্ধতি ফলপ্রসূ হয়। মোটামুটি যে অভ্যাসগুলিতে নজর দিতে হয় নীচে দু-ভাগে লেখা হল। অর্থাৎ কী করবেন আর কী করবেন না।

১. যেটা করা উচিত

- প্রত্যেক দিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে শুতে যেতে হবে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে উঠতে হবে।
- ঘুমানোর আগে খিদে পেলে খুব হালকা খেতে হবে।
- শোবার আগে কোনো কাজের চিন্তা বার বার আসলে সেটাকে লিখে রাখতে হবে পরদিন সকালের জন্যে।
- শোয়ার ঘর ঠান্ডা রাখতে হবে।
- শোয়ার ঘর অন্ধকার রাখতে হবে।
- শোয়ার ঘর শান্ত রাখতে হবে।

২. যেটা করা উচিত নয়

- ঘুম না এলেও বার বার ঘড়ি দেখা চলবে না।
- ঘুমের আগে কোনো ব্যায়াম করা যাবে না।
- ঘুম না এলে টিভি দেখা চলবে না।
- রাতে খুব ভারী খাবার চলবে না।
- ঘুমানোর আগে চা/কফি চলবে না। ঘুম না এলে সিগারেট খাওয়া চলবে না।
- মদ খাওয়া যাবে না।
- বিছানায় বসে খাবার খাওয়া যাবে না।
- ঘুম না এলে বিছানায় শুয়ে বই পড়া যাবে না।
- বিছানায় বসে ফোন করা যাবে না।

একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যখন সবথেকে বেশি ঘুম আসবে তখনই বিছানায় যেতে হবে। ঘুম না এলে বিছানায় শুয়ে ছটফট না করে পাশের ঘরে গিয়ে এমন কিছু করতে হবে যেটাতে ঘুম না কেটে যায়।

খ. স্লিপ রেসট্রিকশান থেরাপি (Sleep restriction therapy)

এই পদ্ধতিতে বিছানায় শোবার মোট সময়টা কম করা হয়। যারা বিছানায় শুয়ে থাকে অনেকক্ষণ কিন্তু ঘুমায় অল্পক্ষণ তাদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অধিক কার্যকর। যেমন রোগী বলছে সে শুয়ে থাকে ৮ ঘণ্টা কিন্তু ঘুমায় ৫ ঘণ্টা। তাকে বিছানায় শোবার সময় কম করতে বলতে হবে। তবে কোনোভাবেই সময়টা ৪ ঘণ্টার কম করা যাবে না। দিনের অন্য সময় ঘুম এলেও ঘুমানো যাবে না। তবে বয়স্কদের জন্যে দিনে ৩০ মিনিট ঘুমের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এইভাবে যদি বিছানায় শোবার সময়ের শতকরা ৮৫ ভাগ ঘুমন্ত থাকতে পারে, এবং সেটা অন্তত ৫ দিন প্রতি সপ্তাহে হয়, তবে তাকে আরও ১৫ মিনিট শোবার সময় বাড়াতে দেওয়া যাবে।

গ. প্রগ্রেসিভ মাসল রিল্যাকসেশান থেরাপি (Progressive Muscle Relaxation therapy)

যারা বিছানায় শুয়ে ঘুম আসছে না বলে এমন উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়ে যে বিভিন্ন পেশি টেনসড বা শক্ত হয়ে যায় তাদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কার্যকরী হয়। এটা কোনো থেরাপিস্টের থেকে শিখে নিতে হবে। বলা হয় একটা পেশি গোষ্ঠীকে, ধরা যাক ঘাড়ের পেশি গোষ্ঠী, ৫-৬ সেকেন্ড জোর করে শক্ত করতে হবে তারপর ২০-৩০ সেকেন্ড শিথিল করে দিতে হবে। আর এই শিথিল হওয়ার যে সুন্দর অনুভূতি সেটা উপভোগ করতে হবে। মাথা থেকে শুরু করে পায়ের পেশি গোষ্ঠীর দিকে যেতে হবে।

আরও বেশ কিছু পদ্ধতি আছে। আর আছে অবসাদ, উদ্‌বেগ স্কিজোফ্রেনিয়া রোগে অনিদ্রার চিকিৎসা, যেগুলো মূলত ওষুধ দিয়ে হয়।

ঘুম না হওয়া বড়ো কষ্টের। শরীর মন সুস্থ রাখতে ঘুমের বড়ো প্রয়োজন। আর এই অশান্ত সময়ে ঘুম পাড়ানো মাসি-পিসিরাও সব কোথায় হারিয়ে গেছে। তাই ঘুমের দেশে যেতে প্রয়োজনে কোনো বিশেষ পরামর্শ নিতে দ্বিধা করবেন না। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সুমিত দাশ, এমবিবিএস, ডিপিএম, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। শ্রমজীবী মানুষদের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

Advt.

এখন **দু র্বা র ভা ব না** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুক মার্ক, মনীষা গ্রন্থালয়, বই-চিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়),

বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬।

ভয়ংকর ভবিষ্যৎ

ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র এপ্রিল-মে ২০১৮ সংখ্যায় "বেয়াড়া ব্যাকটিরিয়া" শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান লেখাটি তারই দ্বিতীয় কিস্তি। ২৪ মার্চ বিশ্ব যক্ষ্মা দিবসের আগের দিন একটু অন্যরকম ভাষায় এই লেখাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন **ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত**।

২৪ মার্চ, ওয়ার্ল্ড "টি বি" ডে। আ-মরি বাংলা ভাষায় যাকে বলে—বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস। অবশ্য আ-মরি ভাষাটির অবস্থা, আজকাল ক্রমশ পড়তির দিকে। বাঙালি বরাবরই অতিথিপরায়ণ। ভালোবেসে আপন করে নেয় প্রায় সক্কলকে। আর তাই করে করে, এখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে, যে, লোকে আ-মরি পড়তে গিয়ে অনেক সময় ভুল করে, আমরি (AMRI) পড়ে ফ্যালে। অবশ্য সেইভাবে ভাবতে গেলে, "আমরি"-রও কিছুটা ভূমিকা আছে বই কী বিশ্ব যক্ষ্মা দিবসে! অন্তত আমার জীবনে তো আছেই। ব্যাপারটা তাহলে খুলে বলি।

গতবছর, যক্ষ্মা দিবসের ঠিক আগের রাত্তিরে আমার দাঁতে ব্যথা শুরু হল। প্রথম দিকটায়, কান কটকট, মাঢ়ী দপদপ ব্যথা . . . তারপর ক্রমে ক্রমে ক্রমে, বাড়তে বাড়তে একসময় সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে, কেবলমাত্র একটি অনুভূতিই প্রকট হয়ে রইল—আমার মুখের বাম দিকটা অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। ভীষণ, ভীষণ, ভীষণ রকমের যখন যন্ত্রণা হয়, তখন কীরকম জানি একটা ঘোরের মতো লাগে। মনে হয়, ব্যথার স্থলটুকু ছাড়া, বাদবাকি শরীরটা মরে-টরে গেছে নিশ্চিত। আমি চোখ বন্ধ করে, বিছানায় বাঁ-পাশ হয়ে, একটু একটু করে সেই ব্যথার ঘোরে ডুবে যাচ্ছিলাম।

ভোরের দিকটায়, চোখটা সামান্য লেগেছিল। ফটাস করে ভেঙে গেল সাতটা দশের অ্যালার্মে। আর ঘুম ভেঙে উঠেই, প্রথম যে অনুভূতিটা ফিরে এল, সেটা যন্ত্রণার। সেটা দপদপানির। পাত্তা দিলাম না। হুড়মুড়িয়ে জামা প্যান্ট পরে, স্কুটি চালিয়ে রওনা দিলাম, সদর হাসপাতালের দিকে। সাড়ে আটটায়, ওখান থেকেই শুরুয়াত হবে—পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য এবং জনকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে—যক্ষ্মা দিবস পথ যাত্রা। এই পথ যাত্রা প্রদক্ষিণ করবে সমস্ত জলপাইগুড়ি শহর। অংশগ্রহণ করবেন চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, ক্লাব এবং যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত রুগীরা। মিছিল থেকে ছুঁড়ে দেওয়া হবে লিফলেট—"হাঁচি বা কাশির সময় বাহু ঢেকে হাঁচুন, কাশুন। যেখানে সেখানে কফ থুথু ফেলবেন না। দু-সপ্তাহের বেশি নাগাড়ে কাশি হলে, নিকটবর্তী সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কফ পরীক্ষা করান। টিবি রোগের চিকিৎসা হাসপাতালে বিনামূল্যে করা হয়।"

বছর কয়েক আগে তো এমনকী, স্লোগান-পত্তর লেখা, টি শার্ট অবধি বিতরণ করা হয়েছিল পথচারীদের। কে বলল? ঠিক কেএএএ বলল বলুন তো, "সরকার কিছু করে না!"?? এই পথযাত্রা, তাই আমার বেজায় প্রিয়।

স্বাস্থ্য দপ্তরে যোগদান করেছি আজ এগারো বছর হল। স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠেছে এই এগারো বছরে। প্রতিনিয়ত . . . প্রতিমুহূর্তে মারমুখী সবজান্তা জনতা, চামড়া খুলে ডুগডুগি বাজাতে উদ্যত। তবুও আমি হাল ছাড়িনি। তবুও, আমরা যারা, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত, তারা কেউই হাল ছাড়েনি।

আর কে কী মনে করে জানি না, আর কে কোথায় "গভীর ষড়যন্ত্র"-এর সন্ধান পায় জানতে চাই না, শুধু এটুকু জানি, আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কায়মনোবাক্যে পরিষেবা দিয়ে যেতে প্রস্তুত। এবং, আমি এটাও জানি যে, সরকার, এখনও, আজও, প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে চলেছে, প্রতিটি মানুষকে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার। "সরকার শালা কিছুই করে না" দেগে দিয়ে, ভেগে যাওয়ার চাইতে, আমি চাইব, নিজে এগিয়ে এসে সমাধান সূত্র খুঁজতে।

যাক গে যাক। জ্ঞান-ফ্যান মারিয়ে লাভ নেই! সব্বাই মিলে এইবারে আমাকে সবুজ না লাল না গেরুয়া কোন রঙে রাঙাবেন, সেটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়ার আগে, মূল গল্পে ফিরি।

পথযাত্রার গল্প। দাঁতব্যথার গল্প। আ-মরি এবং আমরির গল্প। একটু ডি ট্যুর করব? প্লিজ প্লিজ। একটু করি? এ-ক-টু-উউ। করি কেমন। আ-মরি/আমরি বলতে গিয়ে আসলে মনে পড়ে গ্যালো, "যক্ষ্মা" কথাটার মানে কেউ বোঝেই না। বোঝে "টি বি"। মাক্কালি। আমি দেখেছি।

রোগীকে গম্ভীর মুখ করে—"আপনার যক্ষ্মা হয়েছে" বললে,

রোগী একগাল হেসে জবাব দেয়—"যাক্, তাইলে টিবি নাই"। এরকম ঘটনা অবশ্য আরও অনেক আছে। কিন্তু এটা কিনা ডিট্যুর, মূল গল্পটা কিনা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে . . . তাই সেরা উদাহরণটাই এক ঝটকায় দিয়ে দিই।

আমি এগারো বছর ধরে মোটামুটিভাবে যা বুঝলাম সেটা হল এই যে—"আপনি যদি প্রেশার মাপেন, আপনি তবে ভালো ডাক্তার . . . আর যদি না মাপেন, তবে আপনি ফালতু", রুগীর পেটখারাপ হোক বা খোস পাঁচড়া, প্রেশার মাপাতে চায় সব্বাই। প্রেশার মাপার যন্তরটার প্রতি, মানবসমাজের এক অমোঘ আকর্ষণ। মাথাফাটা, খাটে ওঠা রোগীর আত্মীয়স্বজনকেও আমি বলতে শুনেছি দাঁত কেলিয়ে—"ডাক্তারবাবু, আমার প্রেশারটাও একবার একটু . . . ।"

প্রথম প্রথম বিরক্তি আসত। তারপর উষ্মা। তারপর ক্রমে হতাশা। আর এখন? এখন কিছুই আসে না। এখন এটা মেনে নিতে শিখেছি যে, চুল্লিতে ঢোকার ঠিক আগটাতে, ঘাটের এবং খাটের মড়াও তড়াক করে উঠে বলতে পারে—

"মরতে পারি . . . কিন্তু কেন মরব? আগে প্রেশার মাপা হোক"। তো এই প্রেশার-টেশার মেপে ঝুপে, আমি যখন ঠোঁটে চুকচুক করে

এখন এটা মেনে নিতে শিখেছি যে, ... ঘাটের এবং খাটের মড়াও তড়াক করে উঠে বলতে পারে—"মরতে পারি . . . কিন্তু কেন মরব? আগে প্রেশার মাপা হোক"

বলি— "প্রেশারটা বেশি গো . . . লবণ খেও না পাতে . . ." তখন অবধারিত ভাবে একটিই কথা শুনি—"বেশি? মানে হাই না লো?"

লে হালুয়া। বললাম না—"আ-মরি"? আরেকটা ছোট্ট ডি ট্যুর যদি করি, আপনারা কি খুউউব ক্যালাবেন? মানে ক্যালাতেই পারেন, স্বরাজের পর এই একটি মাত্র জিনিসেই আপনাদের জন্মগত অধিকার, এবং সেটি "ডাক্তার ক্যালানো"। তা ক্যালান। ক্যালানির ভয়ে ডাক্তারি ছাড়িনি যখন, ডিট্যুর তো কভি নেহি।

বেশ কিছু বুড়ো-বুড়ি আসে আমার আউটডোরে মাথা ঘোরার উপসর্গ নিয়ে, যাঁদের প্রেশার মেপে যখন বলি "হাই", তেনাদের মুখ ঝুলে যায়। চোখেমুখে স্পষ্টত হতাশা। "সে কী গো . . . আমি দুব্বল মানুষ . . . দু-বেলা ভালো করে খেতে দেয় না বউমা . . . তাও হাই?" বোঝো!

আসলে, নিপীড়িত মানুষের ট্রেডমার্ক বোধহয় লো প্রেশার এবং হরলিক্স না খেতে পাওয়ার হতাশা। অঞ্জন চৌধুরীর "ছোটোবউ" মনে আছে? কালি ব্যানার্জি এবং হরলিক্স সোহম?

ডিট্যুর শেষ। মূল গল্প শুরু। যক্ষ্মাদিবস পদযাত্রা। হাঁটতে হাঁটতেই টের পাচ্ছিলাম দপদপানি ব্যথাটা, আবার ঘিরে ধরছে আমাকে। কেমন জানি একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে হাঁটছিলাম আমি মিছিলে পায়ে পা ফেলে ফেলে। পথযাত্রার পরেই আউটডোর। সেখানে ছুটতে হবে একটুবাদেই। পারলে এখনই। কিন্তু . . . আমি আর পারছিলাম না। একটু একটু করে এবার হার স্বীকার করছিলাম, যন্ত্রণার দংশনে। আমার পরিচিত এক ডেন্টিস্ট ভদ্রলোক আছেন। আমার চাইতে বছর খানেকের বড়ো। হুড়মুড়িয়ে গেলাম তাঁরই চেম্বারে। এবং সবকিছু দেখে শুনে তিনি নিদান দিলেন—"সমূলে উৎপাটন"। শুনে তো আমার মাথায় বাজ। কলেজে যখন পড়তাম, তখন একটা বিচ্ছিরি অ্যাক্সিডেন্টে, আমার চোয়াল ভেঙে গিছল খড়াৎ। রাম শ্যাম যদু এবং মধুর মতো সহজে দন্ত উৎপাটন পদ্ধতি, তাই আমার ক্ষেত্রে অচল। আমার দাঁত যদি একান্তই তুলতে হয়, তবে সেটা তুলতে হবে এক্কেবারে অজ্ঞান করে। এখানকার ডাক্তাররা রিস্ক নিতে চাইলেন না। অগত্যা—কলকাতা। অগত্যা আমরি। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরি। আ-মরি নয়। এবং সেই 'আমরি'-তে, ছয় ঘণ্টার ঘোরতর অপারেশনের পর, ছয়খানি দন্ত উৎপাটন—সফল। দাঁত প্রতি, একঘণ্টা। জ্জিও। না, না, সব ক-টি দাঁত ফেলনা ছিল না মোটেও। কিন্তু, বারবার অজ্ঞান করে, দাঁত তোলার বিপদ অনেক, তাই সামান্যতম দাগী দাঁতও—দূর হঠো।

অপারেশনের পর পরেই খেতে পারতাম না কিচ্ছুটি। একলা রাতে, বালিশ ভিজিয়ে কাঁদতাম রোজ রোজ—আমার বুঝি খেতে ইচ্ছে করে না? আমাকে বুঝি ছত্তিরিশেই দিন গুজরান করতে হবে—হবিষ্যান্ন খেয়ে? তারপর একটা সময়, ক্রমে ক্রমে সয়ে গেল সবটাই।

নাহ্, এখনও আমি সব কিছু খেতে পারি না আয়েশ করে এক চোখ বুজে . . . কিন্তু খুশি থাকতে শিখেছি এইটা ভেবে যে, কিছু তো অন্তত খেতে পারছি গপাগপ . . . . অনেকে তো সেটাও . . . মোটমাট কথা এইইই যে, এইবারের বিশ্ব যক্ষ্মা দিবসে, আমি পথে হাঁটলাম ফির সে। পথে হাঁটলাম দৃঢ় প্রত্যয়ে। পথে হাঁটলাম, বিশ্বকে যক্ষ্মা মুক্ত করার প্রয়াসে।

লেখাটা এখানেই শেষ করে দিতে পারতাম। কিন্তু বাংলার চিকিৎসক হিসাবে, পৃথিবীর নাগরিক হিসাবে, আরও ঢের ঢের ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত। এ বিশ্বকে যক্ষ্মামুক্ত করব আমি। নিজেরই কাছে, এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

কিন্তু গুপি গাইন সেই যে বলে গিছল— "এক হাতে তো তালি বাজে না", সেই যে শিখিয়ে গিছল, জাদুজুতো পরে, আশমানে উড়াল দিতে হলে, নিকটজনের হাতটি ধরা, বড্ডো প্রয়োজনীয় . . . তবেই বাজবে তালি . . . তবেই উড়ব, আমরা সবাই, কাঁধে কাঁধ, গলাগলি . . .

তাই, এ লেখা, এখানে শেষ করব না। শেষ করব না ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না, আপনিও হাতটা বাড়িয়ে দেন, আমার হাতের দিকে। এ লেখার শেষটুকু তাই, আপনার ঘুমন্ত মননকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা মাত্র। দিনকয়েক আগে, আমারই এক চিকিৎসক বন্ধু, একটি ফেসবুক পোস্টে, আতঙ্কিত হয়ে, লিখেছিলেন একটি প্রবন্ধ। যার সারমর্ম—"আমার (বন্ধুটির) হাসপাতালে, চারজন স্বাস্থ্যকর্মী একের পর এক টি বি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন . . . এবার যদি আমারও (বন্ধুটির) টি বি হয়?"

সেই পোস্টে লাইক পড়েছে হুড়মুড়িয়ে . . . কান্নার, হতাশার . . . ভালোবাসার সব ইমোজি। কমেন্টের পর কমেন্ট—"ডাক্তারবাবু, আপনার কিচ্ছু হবে না . . . ডাক্তারবাবু, ভগবানের রোগ হয় না . . ." এসব কমেন্ট দেখে, আমি হেসেছি মনে মনে। এসব মন্তব্য পড়ে, আমি কেঁদেছি সঙ্গোপনে।

মাসখানিক আগে, আমি "বেয়াড়া ব্যাকটিরিয়া" নামে একখানা, লেখা দিয়েছিলাম ফেসবুকে (*স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র এপ্রিল-মে ২০১৮ সংখ্যায় লেখাটি ছাপা হয়েছিল)। লেখাটা টি বি-র ওপরেই। এবং সেই লেখার এক এবং একমাত্র উপজীব্য ছিলো এইইইই যে—"দাদারা এবং দিদিরা, যদি ভেবে থাকেন, যে, এই পোস্টে লাইক মেরে, এবং "বাহবা সব্যসাচী" বলে, আপনি আপনার দায়িত্ব সারবেন, তবে

"আমার (বন্ধুটির) হাসপাতালে, চারজন স্বাস্থ্যকর্মী একের পর এক টি বি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন . . . এবার যদি আমারও (বন্ধুটির) টি বি হয়?"

বেজায় ভুল করছেন। সচেতন হন। সময় থাকতে থাকতে, সচেষ্ট হন লড়াইয়ে। নইলে শিগগিরই একদিন সভয়ে আবিষ্কার করবেন, আপনি নিজেও টি বি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন।" আমার বন্ধুটির, সাম্প্রতিক ফেসবুক পোস্টটি, আমার মাস খানেক আগে করা পোস্টের স্বপক্ষেই, হাতে গরম প্রমাণ।

প্রতি, আড়াই মিনিটে, একজন করে, টি বি রুগি মরে যায় এ দেশে। বুঝলেন? মানে, এই যে, এইইই লেখাটি, আপনি যখন পড়ে শেষ করে উঠলেন, তখন, তারই মধ্যে, গোটা দশেক মানুষ মৃত্যু বরণ করেছেন যক্ষ্মায়। এবং শুধু মৃত্যুই বরণ করেননি, ছড়িয়ে গেছেন, আশপাশের মানুষকে, শমন ব্যাকটিরিয়া।

একজন টি বি রোগী, প্রতি বছরে, দশ থেকে পনেরো জন মানুষকে টি বি রোগে সংক্রামিত করে থাকে, যদি তার চিকিৎসা না করা হয়। বীজগণিতের 'জি পি' বা 'জিয়োমেট্রিক প্রোগ্রেশন' মনে আছে তো? হিসাবটা, তাহলে এবার কষে নিন। আপকা নম্বর ভি, জল্দ হি আয়ে গা। এইভাবে চললে—"পরের যক্ষ্মা রুগী আপনিই" অতএব, সাবধান হওয়া জরুরি।

তা, কীভাবে হবেন সাবধান? ঠিক কী কী করলে আপনার টি বি রোগ হবে না? শুনলে হয়তো হতাশই হবেন যে, এমন একটিও উপায় নেই, যা আপনাকে "টি বি প্রুফ" করে তুলতে পারে। উঁহু। সাধে কী আর আমি, সব্যসাচী সেনগুপ্ত, এদের নাম দিয়েছি, বেয়াড়া ব্যাকটিরিয়া? এই শ্লা, কেমন কায়দা করে নিজের নামটা ঢুকিয়ে দিয়েছি খেয়াল করলেন? কপি পেস্ট মালগুলো, চুরি করতে পারবে না আর!

যাক গে যাক, অতটা মুষড়ে পড়ারও কিছু নেই। চাইলে, পেস্ট করার পূর্বে, এই অংশটুকু মুছে নেবেন . . . মাল আপনার। কিন্তু ফায়দা

চিত্র. মুখে রুমাল দিয়ে বা বাহু ঢেকে কাশুন

আমার। কারণ, এতে করে, আরওওও কিছু লোক আপনার ওয়ালে এ লেখা পড়বার সুযোগ পাবেন। এবং অতটা মুষড়ে পড়ার কিছুই নেই, তার আরও একটা কারণ হল এই যে, ক্ষীণ হলেও, টি বি এড়িয়ে চলার কিছু উপায় আছে।

প্রথমত—জন্মের পর বিসিজি ভ্যাকসিন। না, এতে টি বি রোগ আটকাবে না, কিন্তু রোগটিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বাড়বে (এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে)।

নাম্বার টু—যেখানে সেখানে কফ থুতু ফেলবেন না। নিজেও ফেলবেন না, অন্যকেও ফেলতে দেখলে বারণ করবেন। বুঝিয়ে বলবেন, কফের মধ্যে থাকে জীবাণু।

তিন—হাঁচি বা কাশির সময় এই উপরে বর্ণিত ছবিটির মতো করে নাক মুখ চাপা দিন। হাত দিয়ে নয় . . . বাহু বা রুমাল দিয়ে। নইলে, হাতে লেগে থাকা কফ, হ্যান্ডশেকের সময় বা কাজ করতে গিয়ে, চালান হয়ে যাবে অন্যত্র। পারলে হ্যান্ডশেক বর্জন করে ষোলোআনা বাঙালিয়ানা ফিরিয়ে আনুন। "নমস্কার" করুন। বিনা প্রয়োজনে, হ্যান্ড-রেলিং ছুঁয়ে ছুঁয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামার অভ্যাস ত্যাগ করুন। এবং

হ্যাঁ, নিজের ছেলে মেয়ে বউ বাপ মা মাসি পিসি বনগাঁবাসী, সক্কলকে এই হাঁচি কাশির বিষয়টি শেখান।

চার—কর্মস্থল, এবং বাসস্থল, সর্বত্র জানলা দরজা খোলামেলা রাখবেন (রাতে নয়, রাতে তো ডাকাইতের ভয়)। তথ্য বলছে, কোনো একটি রুমের সমস্ত হাওয়া, যদি এক ঘণ্টায় দশ থেকে পনেরো বার রিপ্লেসড হয় তাজা হাওয়া দিয়ে, তবে টি বি রোগ ছড়াবার সম্ভাবনা কম। মানে, সোজা কথায় বলতে গেলে, ঘরের ভিতরের হাওয়া আর বাইরের হাওয়া, যদি স্থান পরিবর্তন করে, ঘণ্টাপ্রতি দশ পনেরো বার, তাহলেই কেল্লাফতে। তাই, ঘরদোর খোলামেলা রাখুন।

আমার চিকিৎসক বন্ধুদের বলি, রাউন্ডে গিয়েই, নির্দেশ দেবেন, সব জানালা দরজা খুলে দিতে। এতে প্রাথমিক—"হাউ মাউ . . . জানালা খুললে বেড়াল ঢোকে . . ." এসব হবে, কিন্তু বায়ুঘটিত সংক্রমণজনিত রোগ থেকে পেশেন্টরা এবং আপনারা, বাঁচবেন।

পাঁচ—খামোখা মুখে হাত দেওয়া, নাক খোঁটা, দাঁতে নখ কাটা, এসব পরিত্যাগ করুন। এভাবেও টি বি ছড়ায়। "দ্যাখো বস . . . আমার অত টাইম নেই . . . আমি হাত-ফাত না ধুয়েই খাই, তারপর আবার কাজে লেগে যাই" এসব পেঁয়াজি বন্ধ করুন। দুপুরে বা রাতের খাবারের আগে হয়তো প্রায় সবাইই হাত ধুয়ে থাকেন, কিন্তু সেই একই অভ্যাস বজায় রাখুন , বিস্কুট খাওয়ার ক্ষেত্রেও। "কী করে ধোব, জল কোথায়, কাজের যা চাপ . . ."এসব প্লিজ, মাইরি প্লিজ, বলতে আসবেন না।

তথ্য বলছে, কোনো একটি রুমের সমস্ত হাওয়া, যদি এক ঘণ্টায় দশ থেকে পনেরো বার রিপ্লেসড হয় তাজা হাওয়া দিয়ে, তবে টি বি রোগ ছড়াবার সম্ভাবনা কম।

ছয়—বছরে একবার করে সুগার টেস্ট করান। ডায়াবেটিস হলে, টি বি হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় দড়াম করে।

সাত—নিজের বা ওই মাসি পিসি বনগাঁবাসীর দু-সপ্তাহের বেশি নাগাড়ে কাশি হলে, নিকটবর্তী, সরকারি সরকারি সরকারি এবং সঅঅঅঅরকাআআরিইইই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনা পয়সায় কফ পরীক্ষা করান। বেসরকারি ল্যাবগুলোর, সিংহ বা বাঘ বা ডাইনোসর ভাগেরই, টি বি রোগ ধরবার মান্যতা নেই। ইউনিভার্সাল অ্যাকসেস বলছে—"আপনি চাইলে, সরাসরি হাসপাতালে গিয়ে বলতে পারেন, আমি কফ পরীক্ষা করাতে চাই।"

আট—আমার চিকিৎসক বন্ধুগণ, প্লিজ, যে সমস্ত অ্যান্টিবায়োটিক টি বি জীবাণু মারতে সাহায্য করে, সেগুলো, নিতান্ত অনন্যোপায় না হলে, অন্যত্র ব্যবহার করবেন না। মাথায় রাখবেন, এতে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টি বি বাড়ছে। এবং সেটা, আপনার নিজেরও হতে পারে। তখন কেঁদে লাভ নেই।

নয়—দাদা দিদি ভাই বোন চুন্নু মুন্নু টুন্নু, শুনে রাখুন, আপনি বা ওষুধের দোকানদার, ডাক্তার নয়। তাই যদি হত, তবে বইয়ের দোকানের মালিক হতেন শিক্ষক। "একটা কাশির অ্যান্টিবায়োটিক দিন তো দাদা, একটা পেটখারাপের বড়ি দেখি . . ." বলাটা বন্ধ করুন। শেষটায় আপনার যদি টি বি হয়, তবে টি বি-র ওষুধ কাজ নাও করতে পারে কিন্তু।

নয়টা পয়েন্ট হলেই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কথায় আছে—"দেশে ও দশে" কবিতায় আছে—"হারাধনের দশটি ছেলে" সিরিয়ালে আছে—"দশ কা দম" এমনকী, সদ্য নির্মিত ঝাঁ চকচকে মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালগুলিও—"দশতলা" তাই, পয়েন্ট নাম্বার দশ—এই পোস্ট যদি কেউ, আদপেও শেষ অবধি পড়ে থাকেন, তবে উপরিউক্ত নয়টি বিষয় মনে প্রাণে মেনে চলুন। অন্যকেও শেখান। এবং হ্যাঁ, শিশুদের শেখান। শিশুরা ছোটো থেকেই হাঁচি কাশির এটিকেট শিখুক . . . ভবিষ্যৎটা, ওরাই গড়বে।

"একটা কাশির অ্যান্টিবায়োটিক দিন তো দাদা, একটা পেটখারাপের বড়ি দেখি . . ." বলাটা বন্ধ করুন। শেষটায় আপনার যদি টি বি হয়, তবে টি বি-র ওষুধ কাজ নাও করতে পারে কিন্তু।

আজ এ পর্যন্তই থাক। পরে যদি কোনোদিন এ বিষয়ে কলম ধরি, তবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব, সরকার কত কিছু করে চিকিৎসা খাতে।

শেয়ার করতে চাইলে করুন। অনুমতি চাইবার প্রয়োজন নেই।

(ছবিটি, আমার আঁকা, নেট ঘেঁটে, এবং আউটডোরের শেষে . . .)

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

এই লেখাটি ডা. সেনগুপ্তের ফেসবুকের পাতায় আগে প্রকাশিত হয়েছে।

ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত, এমবিবিএস, উত্তরবঙ্গের একটি সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার।

নাগরিক সুস্থতায় সমাজের ভূমিকা

ডা. গৌতম মিস্ত্রী

মানুষ একা বাঁচতে পারে না; মানুষের বেঁচে থাকার জন্য তার চারপাশে সমমর্মী মানুষ ও অনুকূল পরিবেশ লাগে।

ভালো থাকার, সুস্থ থাকার উপায়গুলো ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে

খুঁড়িয়ে চলতে চলতে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে না পড়লে অথবা জলে পড়ে গিয়ে হ্যাঁচোর-পাঁচোর করতে করতে খাবি খাওয়া শুরু না করলে, মানে নেহাত একেবারে বেকায়দায় না পড়লে আমরা ডাক্তারের শরণাপন্ন হই না। এটাও জানি যে, ডাক্তার যে কাজটির জন্য পয়সা পান, তা সে তাঁর মাইনে হোক বা তাঁর পারিশ্রমিকই হোক না কেন, প্রধানত সেই কাজটিই তিনি করতে করতে তাঁর কর্মজীবনের পালা সাঙ্গ করেন। ওষুধবিষুধ সেবনের পরামর্শ, ইঞ্জেকশন ফোঁড়া, অপারেশন ইত্যাদি গুরুগম্ভীর গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের মাঝে "মিড-সেশন ব্রেক"-এর মতো, খানিকটা স্বাদ-বদলের 'বিকল্প টাইম-পাস'-এর উপায় হিসাবে, অস্পষ্ট আকারে-ইঙ্গিতে রোগভোগের বোঝা হালকা করার বা মায় রোগ নিবারণের প্রাকৃতিক উপায়গুলো 'ফাস্ট-ফরোয়ার্ডের' গতিতে ডাক্তার কখনো কখনো আউরে নেন। শুনে মনে হতে পারে, বুঝি-বা ভুল উচ্চারণে সংস্কৃতে পূজার মন্ত্র বলছেন পুরোহিত। "মিষ্টি খাবেন না, ভাতের পাতে নুন খাবেন না, রোজ সকালে হাঁটবেন, ধূমপান করবেন না . . .।" ডাক্তারের সেই মন্ত্রণার মন্ত্র রুগীর কানে খানিকটা ঢোকে, তবে বেশিদিন টেকে না। বেশিদিন যে টেকে না সেটা অনেক রুগী কবুলও করে বসেন। ডাক্তারদের বলেন, এই আপনাকে দেখিয়ে যাবার পরে মাস খানেক হাঁটাহাঁটি হয়। তারপর আবার যে কে সেই। আপনার কাছ থেকে ধাক্কা খাওয়ার জন্যই মাঝে মধ্যে আসতে হয়।

কেন এমন হয়? এমন ভাবতে বসলে মনে হয়, এমনই তো হয়ে থাকে। শিশুকে দাঁত মাজার জন্য তার মা-কে কী খাটুনিটাই না করতে হয় তা কি আর আমরা জানি না! নিজের প্রাণাধিক সন্তানকে দাঁত মাজার অভ্যাসটিকে শ্বাস নেওয়ার মতন করে একটি অতি স্বাভাবিক জৈবিক জীবনযাপনের ক্রিয়ায় পরিণত না করে মায়ের অন্য উপায় নেই। ছাগল, গোরু বা বাঘ—কেউই দাঁত মাজে না। গুহাজীবী মানুষও দাঁত মাজত না। আধুনিক পৃথিবীর প্রায় সব সভ্য মানুষই দাঁত মাজে। কারণ দাঁত না মাজলে দাঁতে ব্যথা হয়, অকালে দাঁত পড়ে যায়, মুখে দুর্গন্ধ হয়। গুহাবাসী মানুষের সঙ্গে শারীরবৃত্তীয় ও জিনগতভাবে ফারাক না হওয়া আধুনিক একবিংশ শতাব্দীর মানুষেরও খাদ্য-পানীয়ের প্রয়োজনের মতো ন্যূনতম শারীরিক শ্রমের প্রয়োজন। শহরের আধুনিক মানুষ আজ বাক্স-বন্দি। সকালে কংক্রিটের দেওয়ালের বাক্স থেকে বাস-ট্রাম-ট্রেন বা গাড়ির বাক্সে করে অফিসের বাক্সে প্রবেশ ডাল-ভাত কামাইয়ের জন্য। রাতে আবার বাড়ির বাক্সে প্রবেশ। বিনোদনের সময় মিললেও মাল্টিপ্লেক্সের সিনেমা হল বা রেস্তরাঁ—হরেক রকমের বাক্সে আমাদের শরীরের নাচন-কোঁদন চলে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি। শারীরিক শ্রমের জন্য সকালে বা সন্ধ্যায় আলাদা করে সময় বের করে হাঁটাহাঁটি করার অভ্যাস আমাদের হয়ে ওঠে না। যদিও দাঁত মাজার প্রয়োজনের মতো সকাল বা বিকেলে হাঁটার প্রয়োজনীয়তা আমাদের অজানা নয়।

একটু ভেবে নেওয়া যাক, জ্ঞানের নাড়ি টনটনে হলেও আমাদের রক্তের সুগারের মাত্রা বাড়বাড়ন্ত হলে বা রক্তের চাপ স্বাভাবিকের ঊর্ধ্বসীমা ছাড়িয়ে গেলে অথবা জামার তলায় নাদুস-নুদুস নেয়াপাতি ভুঁড়ি উঁকিঝুঁকি মারলে আমরা তখনও কেন হাঁটতে চাই না। খাওয়া-দাওয়া আর ঘুমানোর মতো কিছু জৈবিক কাজকর্মের মতো বেশ কিছু কাজ আমরা আনন্দে করি। খিদে পাওয়া আর ঘুম পাওয়ার মতো আনন্দময় অনুভূতিগুলো আমাদের এক অস্তিত্ব বজায়ের অবচেতন চেষ্টা মাত্র। আবার কিছু কাজ করি নিতান্ত বাধ্য হয়ে। ইচ্ছে না করলেও সাধারণ জ্বরজ্বালা হলে অফিস-কাছারিতে কাজ করতে যাই। অর্থাৎ তাৎক্ষণিক সুখানুভূতির চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি মঙ্গল আমাদের প্রয়োজনীয় প্রেরণা দেয়। তবে এটা ঠিকই এই প্রেরণার মাত্রার ফারাক আছে, ফারাক আছে এই সব আপন ও গোষ্ঠীবদ্ধ স্বার্থের একান্ত প্রয়োজনীয় প্রেরণার ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে। দৈনন্দিন কালযাপনের যে মূল্যবান তাগিদগুলো প্রেরণার উপরে ভর করে চলে, তখনও অবচেতন অভ্যাসে পরিণত হয়ে উঠতে পারেনি, সেই তাগিদগুলোকে উজ্জীবিত রাখার উপযুক্ত জল-হাওয়া জোগানোর দায়িত্ব কিছুটা নিজের হলেও অনেকটা আমাদের ঘিরে থাকা সমাজের উপরেও বর্তায়। এই প্রয়োজনবোধটা যে সমাজ স্বীকার করে, দায়িত্বটা পালন করে, সেই সমাজ পৃথিবীতে বেশ খানিকটা সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করে। ফিনল্যান্ডের মানুষদের হাঁটার জন্য ডাক্তারদের উপদেশের প্রয়োজন হয় না, বরং সেখানে হাঁটার জন্য ও সাইকেল চালানোর জন্য উপযুক্ত রাস্তা না থাকলে সাধারণ মানুষ খেপে ওঠে। আমাদের সমাজ সেই রকম সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছাতে পারেনি। কেন পারেনি তার

চেয়েও বেশি জানা দরকার কীভাবে আমাদের অতি দুর্বল সু-অভ্যাসের ক্ষণস্থায়ী প্রেরণাগুলির পালে উজানের সামাজিক পরিমণ্ডলের হাওয়া-বাতাস লাগানো যায়। অতি প্রয়োজনীয় সেই সামাজিক পরিমণ্ডলের অভাবে দুর্বল প্রেরণাগুলির অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আমাদের চারপাশের গায়ে পরশ লাগা পৃথিবী আমাদের যেমন বেঁচে থাকার প্রাণবায়ু জোগায়, সে আবার তেমনই আমাদের অস্তিত্বের মান ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। পরিমণ্ডলের প্রভাব আমাদের অস্তিত্বকে বিশালভাবে প্রভাবিত করে। তেমনই তিনটি বিষয় নিয়ে স্বল্প আলোচনা করে ক্ষান্ত হব। না হলে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হতে বাধ্য। এই নিবন্ধে সচেতনভাবেই টিকাকরণ, পরিশ্রুত রোগজীবাণু মুক্ত পানীয় জল, স্বাস্থ্যকর শৌচালয় ইত্যাদি স্বাস্থ্যের অনুকূল সামাজিক পরিমণ্ডলের আলোচনা উহ্য রইল।

১. প্রাতঃভ্রমণের জন্য রাস্তা বা খোলা মাঠ চাই

অনেক চেঁচামেচি করে অনুনয়-বিনয় করে না হয় আমারই মতো কোনো এক কুঁড়ে মানুষকে খুঁতখুঁতে এক ডাক্তার হাঁটতে উদ্বুদ্ধ করলেন। আমিও দিনক্ষণ দেখে নতুন ট্রাক-স্যুট ও স্নিকার পরিহিত হয়ে, অ্যালার্ম ঘড়ির ধাক্কায় শীতের সকালে রাস্তায় নেমে পড়লাম। কিন্তু এবার কোনদিকে যাই? রাস্তার ফুটপাত বলে অংশটি অনেকদিন আগেই হয় হারিয়ে গেছে নতুবা ডাকাতি হয়ে গেছে। খানা-খন্দর, খোলা ম্যান-হোল, ঝুপড়ি দিয়ে বেদখল—অক্ষত হাত-পা নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফেরাটাই এক আতঙ্কের বিষয় হয়ে ওঠে। আগে পাড়ায় পাড়ায় অন্তত এক-দুটো খোলা মাঠ থাকত। সেগুলো সব এখন রেলিং দিয়ে ঘেরা পার্ক, মাঝখানে একটা বড়ো গর্ত। ওই গর্তে নাকি পার্কের জন্মলগ্নে কিছুকাল একটা ফোয়ারা জল ছিটাত। এখন ওটা ডাস্টবিন, পানের পিক আর প্লাস্টিকের আবর্জনা ফেলার ভ্যাট। ফোয়ারা শুকিয়ে যাবার ভূমিকার আমার পাঠ না থাকলেও, সেই গর্তে প্লাস্টিকের আবর্জনা আমিও ফেলে থাকি। এমনিতেই আমার আবার হাঁটতে বড়ো কষ্ট হয়, হাঁটুতে ব্যথা করে। ভাবলাম, হাঁটার জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করে পথে নামলাম, যদি একটু নিরাপদ একটুকরো পৃথিবী পেতাম! এই তো সেদিন পাশের বাড়ির ভদ্রলোক, সকালে হাঁটতে গিয়ে ফুটপাতে উপরে উঁচু করে সরিয়ে রাখা ম্যান-হোলের কংক্রিটের স্ল্যাবে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লেন। তারপর সকালে স্বাস্থ্য উদ্ধারের হাঁটা তো দূরের কথা, হাতে-মুখে ব্যান্ডেজ বেঁধে এখন অর্থোপেডিক ডাক্তারের শরণাপন্ন। ঘরের মধ্যে হাঁটতে গেলে সাপোর্ট লাগছে। বিশেষজ্ঞগণ বলতেই পারেন, ছোট্ট শিশু হাঁটা শেখার সময় অমন আছাড় খায়, বা সাঁতার শিখতে গেলে অনেকেই দু-এক ঢোক নোংরা জল খেয়ে ফেলে, তাই বলে কী . . . । এইখানে প্রয়োজনের তাগিদ আর প্রেরণার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। প্রাতঃভ্রমণের তাগিদ অতটা জোরালো নয়, অন্তত ছা-পোষা বাঙালি বা বৃহত্তর ভারতীয়দের কাছে। ওটা না করলেও নিকট ভবিষ্যতের পাওনা-গণ্ডায় কিছু ঘাটতি পড়বে না। প্রাতঃভ্রমণের ফল কিছু আর উচ্চ-ফলনশীল ধানের বীজ নয়। আমি আজ হাঁটলে আজই হাতে গরম কিছু প্রাপ্তিযোগ হবে না। দু-দিন পরে হাঁটা শুরু করলে ক্ষতি কী? যদি কোনো ক্রমে একটানা চার-পাঁচ মাস ধরে নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করা যায়, তবে তার সুফল দৃশ্যমান হবে অন্যের কাছে, আমার কাছেও। ততদিন প্রেরণা ধরে রাখার জন্য উপযুক্ত সামাজিক পরিমণ্ডল চাই। হাঁটার জন্য জিমনাসিয়ামে যাবার উপায় বা বাড়িতে ট্রেড-মিল কেনার পয়সা ও রাখার জায়গা নাও থাকতে পারে। গড়ের

> বইয়ের নেশা, খেলার নেশা, মাছ ধরার নেশা . . . এগুলো ঠিক ক্ষতিকর নেশাপ্রবণ ব্যবহার নয়। কিন্তু ক্ষতিকরও কিছু আছে। এরমধ্যে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা গেছে, “internet addiction”-কে।

মাঠে হাঁটতে যাবার মতো গাড়ি ও ততোধিক প্রয়োজনীয় অবসর না থাকলে বাড়ির কাছে হাঁটার উপযুক্ত রাস্তা বা মাঠ চাই। খোলা মাঠকে রেলিঙের বেড়া দিয়ে পার্ক বানানোর সস্তা ও চটকদার চক্রান্ত ঠেকানো চাই। সাইকেল চালানোর জন্য নিরাপদ ও স্বতন্ত্র ট্রাক চাই, যেমনটা অনেক ধনী ও সভ্য দেশে আছে।

২. চলার পথে স্বাস্থ্যকর খাবার চাই

বাড়িতে আপনি সস্তায় পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার-দাবার খেতেই পারেন। কিন্তু যদি ট্রেনে চেপে বারাসাত বা বনগাঁ যেতে হয়? কিংবা হাওয়াই জাহাজে চেপে আমেদাবাদ অথবা আগরতলায়? নিদেন পক্ষে কাজের খাতিরে সারাদিনের জন্য এসপ্ল্যানেড বা ডালহৌসিতে সময় কাটাতে হয়। খিদে তো পাবেই। কী খাবেন পথে-ঘাটে? পয়সার অভাব না থাকলে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রচুর হাল ফ্যাশনের ফাস্ট-ফুডের দোকান পাবেন, যেগুলোকে ওনারা আউট-লেট বলেন। ওগুলোতে যেসব খাবার পাওয়া যায়, যেমন কেক, প্যাস্ট্রি, পিৎজা, পাই, যেগুলো আবার কাপুচিনো বা কোক সহযোগে গলাধঃকরণ করতে হয়। তাতে চিনি, মাখন, ময়দা আর চিজ আছে অঢেল। কম পয়সায় পেটের খিদে মেটাতে হলে ফুটপাতের রসালো খাবার পাবেন রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনের সারিবদ্ধ অস্থায়ী দোকান থেকে মফস্সলের বাসস্ট্যান্ডের সামনে অবধি। কড়া করে ভাজা, জমকালো সসে মাখো-মাখো চাউমিন বা সাতদিনের বাসি ও নয়-দোকানের মাংসের ছাঁটের মাটনের গোলা পোরা এগরোল, যাতে নুনের সরবতে বিভিন্ন রং মিশিয়ে সসের আরকে ঘাঁটা পিঁয়াজ-গাজরের কুচি মেশানো থাকে। আর যদি সঙ্গে

খাবার না নিয়ে লোকাল ট্রেনে চড়েছেন তো, ঘটি-গরম বেসনের চুড়মুড়ে চূর্ণ লেবু লঙ্কা সহযোগে বা প্লাস্টিকের প্যাকেটে বিভিন্ন আকারে ট্রান্স-ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবার আমার আপনার খিদের তাড়নার সুযোগের (অ)সদ্ব্যবহার করতে চোখের সামনে নাচবে। বিত্তবানদের আর আধা-বিত্তবানদের যাওয়া-আসা আকাশ পথে হয়ে থাকে। সেখানেও রক্ষা নেই। এয়ারপোর্টে ও বিমানের মধ্যে পাবেন সাতদিনের বাসি রেফ্রিজারেটরের কুঠুরি থেকে বার করা চিনি-ময়দা-মাখন-মাংসের ভিন্ন ভিন্ন আকারের ও আবেদনের খাবার। কেনার পরে মাইক্রো-ওভেনে গরম করে দেবে। মোদ্দা কথা, যেটা আপনি স্বাস্থ্যসম্মত খাবার বলে এতকাল জেনে এসেছেন, যেটা আপনার ডাক্তারও বলে দিয়েছেন, সেরকমটি খাবার কোথাও হাতের নাগালে পাবেন না। এই সকল জায়গায় ফল-ফলাদি, চিঁড়ে-মুড়ি-ছাতু-ছোলা বা ডাল-রুটি-তরকারি সহজে মেলে না। বিস্তর খোঁজাখুঁজি করতে হয় স্বাস্থ্যকর খাবার ব্যাপারে একরোখা হলে। সমস্যা হল তার জন্য অতিরিক্ত সময় আর নাছোড়বান্দা প্রেরণা থাকতে হয়। খিদে পেটে খোঁজাখুঁজি করার মতো একরোখা মানসিকতা থাকতে হয়। শরীরের পক্ষে সু-খাবার জোগানোটা বেশ পরিশ্রমের। বর্তমান সামাজিক পরিমণ্ডলের কাছ থেকে সহযোগিতা মেলে না।

প্রেরণা থেকে অভ্যাস

সহজ করে বললে সকালে আপনার হাঁটতে যাবার ইচ্ছে হলে, সেই ইচ্ছেটা হয়তো দুর্বল, সেই ইচ্ছেটাকে লালন-পালন করে বড়ো করে তোলার ক্ষমতা সমাজেরই আছে, দায় সমাজের উপরেই বর্তায়। দাঁত মাজার অভ্যাস তৈরির কথা একবার স্মরণ করা যাক। শিশুকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছুকাল দাঁত মাজতে বাধ্য করা হয়েছে। ক্রমে সে তার সুফল উপলব্ধি করে দাঁত মাজার ক্রিয়াটিকে অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে। বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানীগণ পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝেছেন ও বলে গেছেন, বারংবার কোনো ক্রিয়া করতে করতে আমরা সেই ক্রিয়াটিকে অভ্যাসে পরিণত করে নিতে পারি যদি সেই কাজকর্মের ফল আনন্দদায়ক হয়। বৈজ্ঞানিকগণ এটাকে ধনাত্মক আত্ম-প্রেরণা (positive feedback, positive reinforcement) নাম দিয়েছেন। মনস্তত্ত্ববিদ থর্নডাইক (Thorndike, 1898) পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, একটি বিড়ালকে একটি ঘুলঘুলাইয়া-বাক্সে (puzzle box, যার থেকে বেরোনোর অনেক উপায় বিড়ালের সহজাত অভ্যাস নয়) রেখে বাক্সের বাইরে খাবার রেখে দিলে বাক্সের গোলকধাঁধা থেকে বিড়ালটির বেরোতে প্রথমে বেশি সময় লাগলেও এই পরীক্ষাটা বার বার করলে পরের দিকে সময় ও আয়াস কম লাগে। গোলকধাঁধা থেকে বেরোনোটা তার তখন আনন্দদায়ক অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। যে সু-অভ্যাসগুলি যথেষ্ট প্রেরণার অভাবে অভ্যাসে পরিণত হতে পারছে না, সেগুলোকে প্রথমের দিকে বার বার করার প্রেরণা ও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব আমাদের সমাজকেই নিতে হয়। ধনাত্মক আত্ম-প্রেরণার মতো ঋণাত্মক আত্ম-প্রেরণাও (negative feedback) হয়। সেগুলো 'ড্রাগ-ডিঅ্যাডিকশন' কেন্দ্র ব্যবহার করে। মদের নেশা কাটানোর জন্য এমন পদ্ধতির প্রয়োগ হয়।

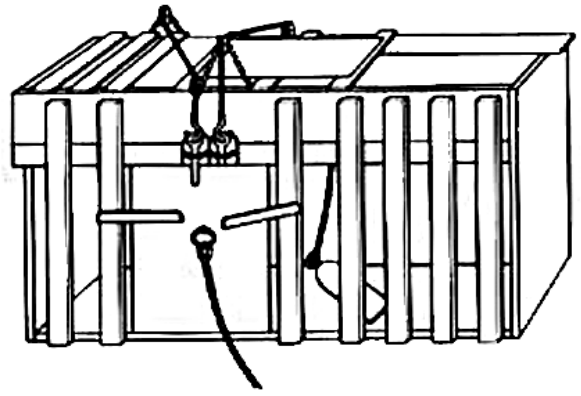

মনস্তত্ত্ববিদ থর্নডাইক-এর বিড়ালের উপরে পরীক্ষিত গোলোকধাঁধা।

৩. শৈশবে ও কৈশোরে সু-অভ্যাস গড়ে তোলার ও কুঅভ্যাস থেকে বিরত থাকার জন্য ভাবী বাবা-মায়েদের প্রশিক্ষণ চাই

শৈশবে আমাদের চারপাশের বাড়িতে রেডিয়োর আকাশবাণী একমাত্র ঘরোয়া বিনোদন ছিল। তখন রেডিও বাজাতে (ওই যন্ত্রটা থেকে কেবল শব্দ বেরোত বলে তানপুরা বা তবলার মতো ওটাও বাজানো হত।) হলে সরকারকে লাইসেন্স ফি দিতে হত। বিনোদনের অন্তরঙ্গ সময়ে বাণিজ্যিক জগতের অনুদান ও অধিকার কায়েম হয়নি বলে সরকারি আকাশবাণী বিনে পয়সায় মিলত না। আমাদের বাড়িতে আমাকে নিয়ে তিনটি কিশোর-কিশোরী স্কুলের গণ্ডি পেরোনোর আগে আমাদের অভিভাবকরা রেডিয়ো কেনেননি। এটা হয়তো চরম উদাহরণ, এখন সেটা অবাস্তবও বটে, কিন্তু শিশুর অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য তাদের আদর্শ স্বরূপ তাদের বাবা-মায়ের কৃচ্ছ্রসাধনের সুরটা এরকমই।

মোটা হবার জন্মগত বা জেনেটিক বৈশিষ্ট্য (চলিত ভাষায় 'ধাত') বলে কিছু হয় না রান্নাঘরের পারিবারিক সংস্কৃতি বয়ে চলে বংশ-পরম্পরায়

কিছুদিন আগে এক স্থূলকায়া মা তার ততোধিক স্থূল-বপু স্কুলে পাঠরত ছেলেকে নিয়ে এলেন তার হার্টের ব্যায়রাম আছে কিনা এই সন্দেহ নিরসনের জন্য। বললেন, তাদের বংশে নাকি মোটা হওয়ার ধাত। সে নাকি সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলেই হাঁপিয়ে যায়। ছেলের শরীরের মাপজোক নিয়ে দেখা গেল, ছেলেটির ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে ২০ শতাংশ বেশি। অর্থাৎ ছেলেটির পা, হার্ট, ফুসফুস ওই অতিরিক্ত ২০ শতাংশের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে অহর্নিশি। সর্বক্ষণ দশ-পনেরো

কিলোগ্রাম ভার বয়ে নিয়ে বেরালে হাঁফ ধরবে বই কী। ব্যায়ামের কথা দূরে থাক, মায়ের হাতে একটি মেগা সাইজের কোল্ড-ড্রিঙ্কসের পেট-মোটা বোতল। মা ও ছেলে মিলে জুলে ওর থেকে মিষ্টি পানীয় পান করে চলেছে। আমি বললাম 'ওটা কেন?'। মা বললেন, এটা আমার এনার্জি ড্রিঙ্কস। আমার ছোটোবেলার অভ্যাস। সারাদিন বিস্তর খাটাখুটি করার পরে ওকেও দিই। আমি বললাম ওকে টিফিন দেন না? ছেলে ব্যাগ থেকে আলুর চিপসের খালি প্যাকেট বার করে প্রমাণ দিল।

এক এক বাড়িতে এক এক রকমের রান্নার পদ্ধতি চলে আসে পরম্পরায়। বাবা-মা যে খাবারে মোটা হয়, সেই খাবার বাড়ির ছোটোরাও মুখে-ভাতের বয়স থেকে খেতে শুরু করে। ছোটোবেলাকার সেই খাবারে আমাদের জিভ অভ্যস্ত হয়ে যায়। সেই অভ্যাসের বশে কেদারনাথের মন্দিরের পাশে বাঙালি হোটেল খুঁজে আলু-পোস্ত আর আলু-ভাজা খাই। এমন রান্নাঘরের সংস্কৃতিওয়ালা বাড়ির শিশু যখন বড়ো হয়ে বাবা-মা বনে যায়, তারাও পরের প্রজন্মকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বংশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খাবারের স্বাদে আসক্ত করে দিয়ে যায়। আমরা রান্নাঘরের অবদানকে জন্মগত পারিবারিক মোটার ধাত বলে অদৃষ্টকে অভিসম্পাত করে দায়মুক্ত হতে চাই। মোটা ও রোগা পরিবারের মানুষের পাচন প্রক্রিয়ায় কোনো ফারাক নেই। এক বোতল কোল্ড ড্রিঙ্কস পান করলে মোটা পরিবারের মানুষের শরীরে যেটুকু মেদ জমা হবে, রোগা পরিবারের মানুষের শরীরেও সেটুকু মেদ জমা হবে। প্রয়োজন অসুস্থ পারিবারিক খাদ্য-সংস্কৃতির কঠিন বলয়ের বাইরে বেরোনোর দৃঢ় সংকল্প। ভারতীয় তথা বাঙালির বিগত শতাব্দীর খাবার ও রন্ধনপ্রণালী বর্তমানের চেয়ে কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যকর হলেও সেটায় এক গরিবি আপোশ ছিল—দুর্ভিক্ষপীড়িত বঙ্গদেশের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত বিশাল সংখ্যক মানুষ, যাঁরা আমেরিকা-ইউরোপে ডেরা বাঁধতে পারলেন না, তাঁরা প্রধানত সস্তার কাঁচালঙ্কা দিয়ে খুদকুঁড়ো আর পান্তাভাত খেয়ে টিকে গেলেন। পরবর্তী প্রজন্মের, তস্য প্রজন্মের ও তস্য প্রজন্মের . . . এইভাবে সেই শর্করাসমৃদ্ধ খাবারে আসক্তি জন্মে গেল। শতাব্দী পার হয়ে গেলেও অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বাঙালির পাতে আলুভাজা আর আলুপোস্তের বাইরে অন্য কোনো সবুজ তরকারি উপহার দিল না। পাঞ্জাবের মধ্যবিত্ত পরিবারের ডাইনিং টেবিলে মাছের ঝোলের এক একটি বাটিতেও দু-তিনটা মাছ উঁকিঝুঁকি মারে। বাঙালির মাছের ঝোলে, ডিমের কালিয়ায়, মাংসের বাটিতে আলু এক শর্করা-প্রীতির নিদর্শন হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রাখে। ভারতের অন্য কোথাও বিরিয়ানির সঙ্গে আলু মেলে না। আলু অস্বাস্থ্যকর এটা বক্তব্য নয়; ভাত, রুটি, নুডলস, আলু ইত্যাদি সব শর্করা জাতীয় খাবার। খাবারের থালায় শর্করার পরিমাণ ৫০ থেকে ৬০ শতাংশের বেশি হওয়া অস্বাস্থ্যকর। শর্করা সমৃদ্ধ খাদ্য মেদ বাড়ায় আর রক্তের সুগার বাড়ায়। রক্তের কোলেস্টেরলের মুখ্যভাগ শরীর এই শর্করা থেকেই তৈরি করে নেয়। আমাদের সারাদিনের খাবারের অর্ধেক অংশ প্রোটিন, রঙিন সবজি, ফল, কাঁচা বাদাম আর কাঁচা (কড়াইয়ে না গরম করা) জৈব তেল থেকে পাওয়া উচিত। অথচ খাবার কেনার পয়সায় অভাব না থাকলেও কেবল অস্বাস্থ্যকর খাদ্যরুচি ও অভ্যাসের বসে বাড়িতে অথবা পাঁচতারা হোটেলে কিংবা বিনে পয়সায় খাবারের নিমন্ত্রণ রক্ষায় আমরা প্রায় ৮০ শতাংশ শর্করা জাতীয় খাবার খেতে ভালোবাসি। যে-টুকু স্নেহ বা তেল জাতীয় খাবার খাই, সেগুলো ভেজে নিয়ে খাই। বাড়ির খাদ্য-সংস্কৃতির পরিণাম স্বরূপ বংশ-পরম্পরায় মোটা হয়ে যাবার প্রবণতাকে পারিবারিক অমোঘ অদৃষ্টের অপরিবর্তনীয় "ধাত" মনে করে পাশ ফিরে শুই।

আবার কোনো কোনো বাড়িতে বসার ঘরে বা খাবার ঘরের কেন্দ্রে সর্বদা সচল এক টেলিভিশন, সকাল থেকে রাত অবধি সেটা চালু। সেই ভরকেন্দ্রের চারদিকে বাড়ির মানুষগুলো চরকি কাটতে কাটতে সময় সুযোগ হলেই ধপাস করে সোফায় তলিয়ে যায়, হাত-পা নাড়ানোর বা গা-গতর খাটানোর দরকার হয় না। সকাল থেকে রাতের বিছানার বাইরের সময়টায় স্কুল-কলেজ-অফিসে বড়ো ধকল যায়। তাই টেলিভিশনের সামনে আরাম-বিশ্রাম করার জন্য সোফা, আরাম-কেদারা, ডিভানের সুবন্দোবস্ত। সবাই সেখানে পকোড়া ও পটাটো-চিপস দিয়ে চা-কফি-সরবত-দুধ পান করে পিত্ত রক্ষা করেন। মোটা হয়ে যাবার কারণের গোয়েন্দাগিরিতে ভুলক্রমে এই পারিবারিক আচারগুলো উহ্য থাকে, পরিবারের ধাত মুখ্য হয়ে যায়।

সুস্থ থাকার উপায়গুলো, যেমন বাড়ির কাছে নিরাপদ ও আনন্দদায়ক হাঁটার রাস্তা, পথেঘাটে স্বাস্থ্যকর খাবার উপায়, বংশ-পরম্পরায় চলে আসা পারিবারিক খাদ্য-সংস্কৃতির সংশোধন, বাড়িতে বিনোদনের স্বাস্থ্যকর উপায়—ইত্যাদিতে এককভাবে কোনো মানুষের নিয়ন্ত্রণ নেই, সে কেবল তাতে লালিত-পালিত হতে পারে মাত্র। দু-একজন প্রবল ইচ্ছে-শক্তিওয়ালা মহামানব ছাড়া সাধারণ মানুষের সমাজের প্রভাব থেকে পরিত্রাণ নেই, যেমন মশার বাড়বাড়ন্তে ডেঙ্গি বা ম্যালেরিয়া থেকে এককভাবে আমি বা আপনি রক্ষা পেতে পারি না। সেটা আশা করাও যায় না। এই মুহূর্তে পৃথিবীতে সুস্থ দেশগুলি হল—নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, জাপান, আইসল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, সিঙ্গাপুর, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি। অপেক্ষাকৃত উন্নত ও জাতিগতভাবে সুস্থ দেশের সুস্থ থাকার উপায়গুলো গোপন বিদ্যা নয় মোটেই। সেগুলো বিচার-বিবেচনা করে প্রয়োগকৌশলগুলো শিখে নিতে না পারলে আমরা সবাই মিলে সুস্থ থাকতে পারব না; তা সে স্বাস্থ্য খাতে যত টাকাই বরাদ্দ হোক না কেন। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. গৌতম মিস্ত্রী, এমবিবিএস, এমডি, ডিএম, কার্ডিয়োলজিস্ট, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

খেলা ও মানসিক স্বাস্থ্য

রুমঝুম ভট্টাচার্য্য

আমাদের সামাজিক পরিবেশ বদলেছে। বদলেছে খেলার ধরনধারণ। আগের মতন শিশুরা এখন মাঠে নেমে খেলাধুলা করতে পারছে না বা হয়তো অনেকক্ষেত্রে চাইছেও না। কারণ ঘরে বসে মোবাইল বা কম্পিউটারে খেলার মধ্যে ঘাম ঝরানো পরিশ্রম নেই। খেলার এই বদলে যাওয়া প্রকৃতি কি মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর কোনো প্রভাব ফেলছে? সেই নিয়েই এবারের লেখা।

মনোবিদ্ হিসাবে কাজ করতে গিয়ে দেখছি শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিভিন্ন কারণে। অবশ্য বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয় সেজন্য দায়ী। আমার মনে হয়েছে জীবনশৈলীর বিভিন্ন জটিল দিকগুলো মোকাবিলা করার জন্য যে মানসিক জোর প্রয়োজন তা শিশুরা অনেকক্ষেত্রেই জুটিয়ে উঠতে পারছে না, তার অন্যতম একটা প্রধান কারণ হল তার জীবন থেকে মাঠে নেমে খেলার আনন্দ উধাও হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে খেলা কীভাবে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে?

যখন জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে মোকাবিলা করতে হয় তখন ব্যক্তি মনে করতে পারেন তিনি পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য কিছুই করতে পারবেন না। তিনি ভাগ্যে বিশ্বাসী এবং ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে ফলাফলের জন্য নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করেন। আবার কিছু মানুষ আছেন। তাঁরা সক্রিয়ভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন ও আত্মবিশ্বাসী মনোভাব পোষণ করেন। পরিস্থিতির ওপর ব্যক্তির এই নিয়ন্ত্রণের বোধ (sense of control) মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যাঁরা নিজেদেরকে পরিস্থিতির শিকার মনে করেন তাঁদের উদ্‌বেগ ও অবসাদেরও শিকার হতে হয়। পরিস্থিতির ওপর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণের বোধ শিশুর মধ্যে তৈরি হয় খেলার মাধ্যমে। খেলতে খেলতে শিশু স্বাধীনভাবে নিজস্ব সমস্যার সমাধান করতে শেখে, তাদের নিজের জীবনের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ফলে উদ্‌বেগ ও অবসাদের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। এইখানেই খেলা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের ভিত সুদৃঢ় করে তাকে আত্মবিশ্বাসী হতে শেখায়। খেলার মাঠে কিছুক্ষণের জন্য সে অভিভাবকের নজরদারি থেকে মুক্ত হয়ে নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে। তাই খেলার মাঠ তাদের জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়ার ফলে শিশুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব অনেক বেড়ে গেছে। ফলত তাদের উদ্‌বেগ ও অবসাদ অনেক বেড়ে যাচ্ছে। শৈশব অবসাদ (childhood depression) এখন খুব সাধারণ একটা অসুখে পরিণত হয়েছে।

এর যুক্তি হিসাবে বলাই যায়, বাড়িতে খেলতে না পারলেও আজকাল প্রায় সব স্কুলেই খেলা শেখানো হয় এবং বাচ্চারা স্কুলে কিছুটা সময় খেলাধুলা করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা বিষয় ভেবে দেখার আছে। বাচ্চা কাদের সঙ্গে খেলবে সে ব্যাপারে তার কোনো চয়েস নেই। স্কুলে যাদের সঙ্গে সে পড়ে তাদের সঙ্গে মতবিরোধ হলেও বা নিগ্রহের (bullying) শিকার হলেও শিক্ষক-শিক্ষিকার তদারকিতে তাদের সঙ্গেই সে খেলতে বাধ্য। কিন্তু পাড়ার মাঠে খেলতে গেলে সে নিজের ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে সে কোন দলের সঙ্গে মিশবে বা খেলবে।

খেলা কি তবে আজকের শিশুর জীবনে নেই? নিশ্চয়ই আছে। সে ভিডিও গেমস খেলে। এই জাতীয় খেলার কিছু কুপ্রভাব শিশুর ওপর লক্ষ করা যাচ্ছে। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে অতিরিক্ত ভিডিও গেমস খেললে শিশুর মধ্যে হিংসাত্মক আচরণ বাড়ছে। রাগ হলে সে তার সহপাঠীদের মারছে বা কোনো জিনিস দিয়ে জোরে আঘাত করছে। স্কুলের বাচ্চাদের মধ্যে হিংসাত্মক আচরণের খবর আমরা প্রায়ই সংবাদমাধ্যমের দৌলতে জানতে পারি। আর হবে নাই বা কেন? ইন্টারনেট গেমসগুলোর মাধ্যমে অসুস্থ একটা কাল্পনিক জগতে

দীর্ঘক্ষণ থাকছে তারা। সেখানে ভারচুয়াল যুদ্ধক্ষেত্রে পাইপগান দিয়ে মানুষ মারছে এবং যত বেশি মানুষ মারছে তত বেশি পয়েন্ট পাচ্ছে। স্বাভবিকভাবেই হিংসাত্মক আচরণটি পুরস্কৃত হচ্ছে ফলে তা দীর্ঘস্থায়ীরূপে স্থিত হচ্ছে শিশুর মধ্যে। তাই দেখা যাচ্ছে সামান্য কথা কাটাকাটির জেরে খুন করে ফেলছে তার সহপাঠীকে।

বর্তমানে অতিচঞ্চলতার (hyperactivity) অসুখটিও খুব বেড়ে গেছে খুদে পড়ুয়াদের মধ্যে। তার সঙ্গে মনোযোগের সমস্যা (attention deficit)। এই অসুখটায় শিশুর মধ্যে অতিরিক্ত চঞ্চলতা দেখা দিচ্ছে। সে স্থিরভাবে মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করতে পারে না। এমনকী কোনো একটা খেলাতে একভাবে মনোযোগ দিতে পারে না। এই বাচ্চা মাঠে গিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে খেললে এদের মধ্যে তৈরি হওয়া এনার্জি সংগঠিত খেলার মধ্যে দিয়ে নিঃসৃত হয় ফলে তাদের মনোযোগের সমস্যা অনেকটাই দূর হয়।

হিংসাত্মক আচরণের ক্ষেত্রেও সংগঠিত খেলা যেমন বক্সিং, ক্যারাটে ইত্যাদির মাধ্যমে শিশু তার অবদমিত নেতিবাচক আবেগগুলি প্রকাশ করে তার কুফল থেকে মুক্ত হতে পারে।

ছাত্রছাত্রীদের আত্মহননের খবর তো আজকাল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আমাদের স্কুলজীবনের কথা মনে পড়ে। কিছু ছাত্র ছিল যারা পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়া কিন্তু স্কুলের ইন্টার ক্লাস ফুটবল প্রতিযোগিতায় তারাই হিরো। কিন্তু আজকের দিনে শিশুর জীবনে বিকল্প কমে গেছে। সে একটি বিষয়ে অসফল হলে অন্য কোন ক্ষেত্রে সফলতার সুযোগ আছে, তা তার জানা নেই। তাই নিজেকে ব্যর্থ মনে করে অবসাদের অতলে তলিয়ে যাওয়াই তো স্বাভাবিক। তাই আত্মহনন ছাড়া সে মুক্তির আর কোনো পথ খুঁজে পায় না। বিফলতা ভাগ করে নেওয়ার জন্য তার জীবনে পাড়ার বন্ধু বলে কিছু নেই। নেই যৌথ পরিবারের বন্ধুতুল্য তুতো ভাইবোনেরা। তাই মানসিক চাপের শিকার হতে বাধ্য সে। শারীরিক পরিশ্রম করে ঘাম ঝরিয়ে খেলার মাধ্যমে মানসিক চাপ অনেকটাই লাঘব হয়। এমনটাই জানাচ্ছেন গবেষকরা।

পরিশেষে একথা বললে ভুল বলা হবে যে না-খেলতে পারাই শিশুদের বিভিন্ন মানসিক সমস্যার একমাত্র কারণ। হয়তো খেলতে না-পারার জন্য তাদের মানসিক চাপ কমানোর পরিসর ছোটো হয়েছে। কিন্তু কারণগুলো খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে বিভিন্ন দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতিগুলোই মানসিক রোগের কারণ হিসাবে কাজ করছে। বিশেষ করে স্কুলে আজকাল পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে খেলাকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং বাচ্চারা সেখানে হতাশামুক্ত হবার সুযোগ পাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বাচ্চাদের বিভিন্ন মানসিক সমস্যা নিরাময়ে প্লে থেরাপি ও মিউজিক থেরাপি খুব ভালো কাজ দিচ্ছে। তাই এমনটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে আজকের দিনের সব পরিস্থিতি শিশু বিকাশে প্রতিকূল অবস্থা তৈরি করেছে। বরঞ্চ বলা চলতে পারে আজকের পরিস্থিতি অনুযায়ী, অভিভাবকরা যদি শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার সুবন্দোবস্ত করতে পারেন সেদিকে নজর দেওয়া জরুরি। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক একজন প্রাবন্ধিক ও সাইকোলজিস্ট।

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি
বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান:

কলকাতা: সুমন্ত বিশ্বাস (৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/৯১৪৩৭৮৬১৩৪), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (৬৯৮৮-২২৪১), বই-চিত্র (কফি হাউস তিনতলা), পাতিরাম, ক্রান্তিক, মনীষা (কলেজ স্ট্রিট), অমর কোলে (বি.বা.দী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন) সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী), রথীন-দা (গোলপার্ক) সৈকত প্রকাশন (আগরতলা)।

যোগাযোগ: ই-মেল-utsamanush1980@gmail.com

নিঃসঙ্গ মৃত্যু

রুমঝুম ভট্টাচার্য্য

'যখনই আমি এই নিঃসঙ্গ মৃত্যু প্রত্যক্ষ করি আমার মধ্যে একটা বোধ নড়াচড়া করতে থাকে। আমি বুঝতে পারি ভালোভাবে বাঁচা বোধহয় একটা আর্ট। সেটা শেখা প্রয়োজন—খুব প্রয়োজন' — নির্বিকারভাবে সিগারেটে টান দিতে দিতে বলে উঠল কাইতো, কাইতো নাকামুরা। টোকিও শহরের একটা ফ্ল্যাটে সকলের অজান্তে এক বৃদ্ধ মারা যায়। চার মাস ধরে তার দেহ পচেছে এখানে। চারপাশে পড়ে আছে অভুক্ত খাবার, পচাগলা মৃতদেহের রসে ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ। দুর্গন্ধে নাড়িভুড়ি উঠে আসার জোগাড়। বৃদ্ধ হিরুশীর কোনো বন্ধু ছিল না, স্ত্রী ছিল না, ছিল না নিয়মিত রোজগার। তার ছেলে বছরের পর বছর বাবা-র সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি। হিরুশীও যোগাযোগ রাখার তাগিদ অনুভব করেনি। গত চারমাসে তার কেউ খোঁজ করেনি, কেউ জানেও না কবে থেকে সে অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থেকেছে আর সেই অবস্থায় মারা গেছে। মনে প্রশ্ন জাগে বাঁচার রকমফের আছে বটে, সফলতার আর অসফলতার মাপকাঠিতে জীবনের গুণগত মান নির্নয় করা যায়। মৃত্যুরও যে রকমফের আছে সেটা নতুন করে ভাববার বিষয় বই কী। স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিকতার মানদণ্ডে এই ধরনের নিঃসঙ্গ মৃত্যুকে কীভাবে মূল্যায়ন করা যাবে সে এক বড়ো প্রশ্ন।

নিঃসঙ্গ মৃত্যু বা কোদোকুশি (Kodokushi) জাপানের মতো উন্নত দেশে এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ২০১০ সালে একটা খবর সারা বিশ্বে সাড়া ফেলেছিল। সোগেন কাতো, টোকিও শহরের বৃদ্ধতম মানুষটি (বয়স ১১১ বছর) নাকি নিজের ফ্ল্যাটে মারা গিয়েছিলেন এবং সেই অবস্থায় তিরিশ বছর লোকসমাজের অগোচরে থেকে গিয়েছিলেন। যদিও এই ঘটনাটিকে বিক্ষিপ্ত ঘটনা বলা যেতে পারে। কিন্তু জাপানে নিঃসঙ্গ মৃত্যুর পর সপ্তাহ বা মাস কেটে গেছে অথচ মৃতের খবর জানা যায়নি এমন ঘটনা আকছারই ঘটে থাকে। আর সেই কারণেই, খবর পাওয়ার পরে মৃতের বাসস্থান সাফ করতে কাইতো-র মতো মানুষদের প্রয়োজন। কোদোকুশি-র সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার জন্য, জাপানে এখন ক্লিনিং আপ সার্ভিস নামের ব্যাবসার সুযোগ বেড়েছে। এমনকী ফ্ল্যাটের মালিকদের জন্য ইনসিয়োরেন্স কোম্পানিগুলি নতুন পলিসির ব্যবস্থা করেছে যাতে ফ্ল্যাট ভাড়া দিলে ভাড়াটে যদি কোদোকুশির শিকার হয় সেক্ষেত্রে মালিক সাফাইয়ের খরচ পাবে। এমনকী কোদোকুশির অপবিত্রতা থেকে মুক্তির জন্য শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার ব্যবস্থাও ইনসিয়োরেন্স কোম্পানিগুলি দায়িত্ব নিয়ে করে দিচ্ছে। মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাবসা!!!!

কেমন হয় এই সব অ্যাপার্টমেন্টের অবস্থা? সাফাই কর্মীদের মতে প্রায় সবক্ষেত্রেই অনেকটা একইরকম অভিজ্ঞতা। তাদের নিঃসঙ্গতার ছাপ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে সর্বত্র। গাদা গাদা বিল জড়ো হয়ে থাকে, অভুক্ত খাদ্যাবশেষ, নুডলসের খালি ক্যান, অ্যাশট্রে ভর্তি সিগারেটের টুকরো, জামাকাপড়ের স্তূপ। হয়তো মৃত ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় শৌচাগারে যেতে পারেনি বলে ঘরেই মলমূত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। সেই জমে থাকা মলমূত্র . . . ।

পরিসংখ্যান বলছে, জাপানে বৃদ্ধ মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাপানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু গত কয়েক দশকে জনসংখ্যা হ্রাস পায় এবং তরুণ প্রজন্মের মানুষ কমতে থাকে। জাপানিদের গড় আয়ু হয় পঁচাশি বছর। ফলত প্রযুক্তি ও বিকাশের দিক থেকে এগিয়ে থাকা জাপান আজ বিশ্বের বয়স্কতম দেশ। উন্নতির চূড়ায় পৌঁছাবার তাগিদে জাপানিরা পরিবার প্রথাকে গুরুত্ব দেওয়া বন্ধ করল, ভেঙে পড়ল চিরাচরিত পরিবার প্রথা। নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল বৃদ্ধ জাপান। রয়টার সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী জাপানে বাস করেন প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বৃদ্ধ মানুষ। তাদের মধ্যে বছরে প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষ কোদোকুশির শিকার হন। আশঙ্কা করা হচ্ছে আগামী দশ বছরে যা হয়তো এক লক্ষের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছাবে। দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষরাই কোদোকুশির শিকার হচ্ছেন। কারণ কী? তবে কি মহিলারা পুরুষদের তুলনায় বৃদ্ধ অবস্থায় সমাজের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে তাল মিলিয়ে

চলতে বেশি সক্ষম। নাকি নিঃসঙ্গ জাপানি পুরুষের গামা (gaman) অর্থাৎ এক ধরনের অহংবোধ তাদেরকে সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। সে প্রশ্নের উত্তর সমাজবিজ্ঞানীরা দিতে পারবেন।

'জন্মিলে মরিতে হবে/ অমর কে কোথা কবে' 'মধুকবি'-র এই উদ্ধৃতি চিরন্তন সত্যের নির্ভীক প্রকাশ। মৃত্যু অবধারিত। এ তো সবার জানা। তবুও মৃত্যু স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত নিয়মে সহজভাবে আসুক এমনটা প্রতিটি জীবন্ত মানুষের কাম্য। মৃত্যু যেন জীবনের স্বাভাবিকত্বের শেষ ও চরম নির্দেশক। কাইতো-র কথাই ঠিক। মৃত্যুর রকমফের বুঝিয়ে দেয় জীবনে সুস্থ, স্বাভাবিক ও সামাজিকভাবে বাঁচা কতটা জরুরি। জাপানে নিঃসঙ্গ মৃত্যুর ঘটনাগুলি যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে উন্নতির ইঁদুর দৌড়ে নাম লেখাতে গিয়ে অবহেলিত সমাজজীবন মানুষকে কত মর্মান্তিক পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। আর সেখানেই হয়তো এই নিবন্ধের প্রাসঙ্গিকতা নিহিত আছে। প্রশ্ন তো উঠতেই পারে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের বিকাশশীল দেশে জাপানের গল্প কী প্রাসঙ্গিকতাই বা বয়ে আনতে পারে! আসলে ঠেকে শেখার থেকে দেখে শেখাই বোধহয় এক্ষেত্রে সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়ে উঠবে। অতিরিক্ত প্রযুক্তি নির্ভরতা জাপানের মানুষকে করেছে অসামাজিক ও নিঃসঙ্গ। বর্ধিত বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বহন করার মতো উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। ফলত পরিবারের কাছে তারা বোঝা হয়ে দাড়িয়েছে। যথার্থ চিকিৎসা পরিষেবা দিতে সরকার ব্যর্থ। নব্বই-এর দশকে জাপানের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েন। অনেক বড়ো শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলাতে না পেরে নিঃসঙ্গ জীবন স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছেন। তাছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণেও অনেক মানুষ ঘরছাড়া হয় ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতে বাধ্য হয়। দ্রুত জীবনশৈলী মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক ও পরিবার-বিমুখ করে তুলেছে। ফলত শিথিল হয়েছে পারিবারিক বন্ধন। পরিণামস্বরূপ মানসিক অবসাদ গ্রাস করেছে মানুষকে ।

খুব সম্প্রতি জাপানে কমবয়সি ছেলেমেয়েদের মধ্যে হিকিকোমরি (hikikomori) বা সমাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার প্রবণতা ভীষণভাবে দেখা যাচ্ছে। এরা নিজেদের ঘরবন্দি করে রাখছে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিশছে না, স্কুল যাওয়া বন্ধ করেছে, রোজগারের চেষ্টাও করতে চাইছে না। এভাবে ছয় মাসের বেশি থাকলে হিকিকোমরি বলা হচ্ছে। জাপানে হাজার হাজার তরুণ এই রকম সামাজিক বিচ্ছিন্নতার পথ বেছে নিচ্ছে। এ সম্বন্ধে গবেষণার আশু প্রয়োজন যাতে উপযুক্ত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা যায়।

নিঃসঙ্গ মৃত্যুর খবর আমরাও মাঝে মাঝে পাই, সংবাদপত্রের পাতায়। 'কলকাতার কঙ্কাল' কাণ্ডও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। সেই পরিবারটির পরিণতি সম্বন্ধে আমরা ওয়াকিবহাল। যদিও জাপানের তুলনায় এই সংখ্যাটি অনেক কম। তবু যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়া, বৃদ্ধদের দায়িত্ব না নেওয়ার মানসিকতার বৃদ্ধি, সবার জন্য স্বাস্থ্যের দায়িত্ব সম্বন্ধে সরকারি উদাসীনতা, বাস্তব সম্পর্ক দূরে ঠেলে দিয়ে ভারচুয়াল সমাজে ব্যস্ত থাকার প্রবণতা আসলে এক বধ্যভূমির প্রস্তুতি। 'সাবধান ইন্ডিয়া'। পরিসংখ্যান বলছে ভারতও বৃদ্ধ হচ্ছে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক একজন প্রাবন্ধিক ও সাইকোলজিস্ট।

একক মাত্রা

Advt.

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস
সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র
পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে
গ্রাহক চাঁদা: ১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)
আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন
যোগাযোগ: ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭
দূরভাষ: ৯৮৩০২৩৬০৭৬/৯৮৩০৪৯৩২৩৯

রাজার অসুখ

ডা. অপূর্ব

রাজার ভারী অসুখ।

না না, এ রাজা সে রাজা নয়। এ রাজা হচ্ছে রাজাদা। মানে যে ডক্টর্স চামারি হোস্টেলে রোজ ভোরবেলা পেপার দিতে আসে।

বুধবার ভোরে উঠে চেঙ্গাইল যাব বলে দাঁত মাজছি, একগাল হেসে একতাড়া কাগজ নিয়ে রাজাদা সামনে এসে দাঁড়াল।

—"দ্যাখো দিকিন এই রিপোর্টগুলো।"

দেখলুম অনেকগুলো রিপোর্ট। ব্লাড টেস্ট, ইউরিন টেস্ট, স্টুল টেস্ট, ইসিজি, আলট্রাসোনোগ্রাম। রাজাদার কি ভারী কিছু অসুখ! কিন্তু একদিনও তো কাগজ দিতে কামাই করেনি! বললুম "রিপোর্ট ছাড়ো, কী হয়েছে তাই বলো? শরীরে প্রবলেমটা কী?"

—"না, মানে প্রবলেম সেরকম কিছু না। বয়স তো হচ্ছে, কাজে কাজে শরীরের দিকে নজর দিতে পারি না। ভাবলুম একবার করিয়ে নিই, সব ঠিকঠাক আছে কিনা বোঝা যাবে। খুব সস্তায় হয়ে গেছে, বলো! এই বাজারে এতগুলো টেস্ট, এই টাকায় হয়!"

রাজার রিপোর্টগুলোর তালিকা—

Complete Haemogram, Blood Group, Blood Sugar Fasting, Blood Sugar PP, Urea, Creatinine, Uric Acid, Liver Function Test, Lipid Profile, Sodium, Vitamin D, Potassium, Calcium, Urine Routine, Stool Routine,TSH, ECG, X-ray Chest PA View, USG W/A Screening.

রাজাদার রিপোর্টগুলো দেখিনি সেদিন। সেই থেকে রাজাদার সঙ্গে আমার "তেলেতেলে বন্ধুত্ব কেমন কড়কড়ে হয়ে গেছে" আলী সাহেব (সৈয়দ মুজতবা আলী) গুস্তাকি মাফ করবেন, আপনার মতো সহজে লিখতে পারলে ঝাপতাম না।

রাজার রিপোর্টগুলো দেখতে চাইনি, তার একটাই কারণ ওগুলোর কোনো দরকার ছিল না। ওগুলোর মধ্যে কোনোটার রিপোর্ট খারাপ থাকতেও পারে, বলা যায় না। কিন্তু শারীরিক, মানসিক কোনো অসুবিধার অনুপস্থিতিতে শুধু শুধু পরীক্ষা করানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই। হ্যাঁ, স্ক্রিনিং টেস্ট বলে একধরনের পরীক্ষা হয়, যেখানে রোগলক্ষণের অনুপস্থিতিতেও প্রাথমিক পর্যায়ের রোগ ধরার জন্য পরীক্ষা করানো হয়। কিন্তু সেটা সবার জন্যে নয়। যাদের যাদের ক্ষেত্রে সেই বিশেষ রোগটির জন্যে ঝুঁকি বেশি, রোগটির উপযুক্ত চিকিৎসা আছে ও চিকিৎসায় সুফল লাভের আশা আছে শুধু সেসব ক্ষেত্রেই স্ক্রিনিং করানো উচিত।

আপনি বলতে পারেন যাইই হোক, পরীক্ষাগুলো করিয়ে কিছুটা তো ভরসা পাওয়া যায় যে 'যাক বাবা সব ঠিক আছে তাহলে'। এখানে একটাই কথা বলার, ফালতু কেন ডাক্তার, টেস্টের পেছনে পয়সা খরচা করবেন! সেই টাকায় হিমালয়ে ট্রেকিং করে আসুন, মন ভালো হবে।

এখন বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল, পলিক্লিনিকের যে অ্যানুয়াল হেলথ চেকাপ প্যাকেজগুলো আছে সেগুলোতে মোটামুটি খরচ হয় হাজার থেকে হাজার চার পাঁচ পর্যন্ত। কিন্তু কোনো টেস্টে হয়তো সামান্য খারাপ কিছু এল, তার জন্য আরও কিছু টেস্ট করাতে হল, শেষ পর্যন্ত কিছু পাওয়া গেল কী গেল না, অযথা টেনশনে পড়লেন। টেস্টটা না করালে হয়তো ওইটুকু খারাপের জন্যে কোনোদিনই উল্লেখযোগ্য কোনো সমস্যা হত না। প্রতি হাজারজন হেলথ চেকাপ করালে হয়তো একশো জনের রিপোর্টে কিছু খারাপ বেরোয়। তার মধ্যে ১০ জনের হয়তো সত্যিই খারাপ কিছু থাকে, আর তার মধ্যে ১ জনের ক্ষেত্রে চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য উপকার হয়। এ যেন প্রশান্ত মহাসাগরের কোন মাছটির পেটে রাজকন্যার সোনার আংটি লুকিয়ে আছে তাই খোঁজা!

কোনো শারীরিক সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও বছর বছর জেনারেল হেলথ চেকাপ করিয়ে রোগহার বা মৃত্যুহার (Morbidity and Mortality) কমে না। এ শুধু মনকে উল্লু বানিয়ে রাখা, সব ঠিক আছে কাকা, আল ইস ওয়েল। খাদ্যাভ্যাস পালটানো, শারীরিক পরিশ্রম বাড়ানো অনেক কঠিন। তার চেয়ে বছর বছর হেলথ চেকাপ করিয়ে নেওয়া বরং সোজা ঠেকে। ২০১২ সালে প্রামাণ্য সমীক্ষা সংস্থা কক্রেন বলে "অন্যান্য পদক্ষেপের অনুপস্থিতিতে প্রত্যেকবছর জেনারেল হেলথ্ চেকাপ করিয়ে এই সময়কার পৃথিবীর মূল দুই ঘাতক, অর্থাৎ হৃদ্‌রোগ ও ক্যান্সারজনিত মৃত্যুহারের কোনো পরিবর্তন ঘটে না।"

অপ্রয়োজনে স্ক্রিনিং-এর পেছনে অতিরিক্ত খরচ কমাতে আমেরিকার ন-টি সর্বস্তরীয় চিকিৎসা সংস্থা বেশ কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা বিশেষ কারণ ছাড়া না করানোর সুপারিশ করছেন। 'Choosing Wisely' নামে একটি উদ্যোগ এই সুপারিশগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করছে। সেগুলোর মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে বেশি দেখা যায় সেগুলো দেওয়া গেল:

চিত্র ১. Choosing Wisely Canada-র দু-টি পোস্টার

১. সাধারণ কোমরের ব্যথায় ৬ সপ্তাহের আগে কোমরের এক্স-রে বা এমআরআই করানো অযৌক্তিক। এতে কোনো অতিরিক্ত সুফল পাওয়া যায় না।

২. হাড়ের দুর্বলতা পরীক্ষার ডেক্সা স্ক্যান ৬৫ বছরের কমবয়স্ক মহিলা ও ৭০ বছর বয়স্ক পুরুষদের ক্ষেত্রে করানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

৩. কোনো উপসর্গ ছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ের হৃদ্‌রোগ ধরতে প্রত্যেক বছর ইসিজি বা ইকোকার্ডিওগ্রাফি অপ্রয়োজনীয়।

৪. পরিবারের কোনো মহিলার জরায়ু বা স্তন ক্যান্সারের ইতিহাস না থাকলে ২১ বছরের নীচে প্যাপ স্মিয়ার পরীক্ষা করানোর প্রয়োজন নেই। (আমাদের দেশে অবশ্য জরায়ুর ক্যান্সার খুবই বেশি। আমাদের দেশে আলাদা কোনো নির্দেশিকা না থাকলেও ৩০ বছরের উপরে সকল মহিলার প্যাপ স্মিয়ার করানো প্রয়োজন।)

৫. Asthma বা allergy-জনিত রোগ ধরতে সবার IgE টেস্ট করানো অপ্রয়োজনীয়।

৬. সাধারণ অম্বল বুক জ্বালার উপসর্গে endoscopy করানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

৭. শ্বাসপ্রশ্বাসের কোন অসুবিধা না থাকলে বুকের এক্স-রে অপ্রয়োজনীয়, এমনকী অপারেশনের আগেও নিয়মমাফিক বুকের এক্স-রে করানোর দরকার নেই।

৮. পেটের ব্যথায় টিপেটুপে (পড়ুন ক্লিনিক্যাল এগজামিনেশন) কিছু না পাওয়া গেলে প্রথমেই আলট্রাসোনোগ্রাফি বা সিটিস্ক্যান করানো অপ্রয়োজনীয়।

ল্যাব টেস্ট ছাড়াও আরও বেশ কিছু অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও ডাক্তারদের এড়িয়ে চলার জন্যে সুপারিশ করেছে Choosing Wisely Campaign। সবগুলিই পড়া উচিত। বিশেষ করে ডাক্তারদের।

ডাক্তার কি বোঝেন না যে, এই টেস্টগুলো করিয়ে খুব কিছু লাভ হবে না! অবশ্যই বোঝেন। কিন্তু লেখেন। কিছুটা জেনেশুনে। কিছুটা বাধ্য হয়েও। না লিখলেও চলে, কিন্তু সেই ছোটোবেলা থেকে (থুড়ি মেডিক্যাল ইন্টার্নশিপ থেকে) পরম্পরায় শিখে আসা অভ্যাস সহজে ছাড়া কি যায়? কাজে লাগবে এমন টেস্টের পাশাপাশি আরও কয়েকটা যেন হাতের টানেই খসখস করে প্রেসক্রিপশনে লেখা হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞ রেফার না করলেও চলে তাও রেফারাল লেখা, ক্লিনিক্যাল এগজামিনেশন না করে টেস্ট লেখা। কম খরচের টেস্ট থাকতেও বেশি দামের টেস্ট ভালো বলে লেখা, এসব তো করেই থাকি আমরা, ছোটোবেলা থেকেই। অস্বীকার করে লাভ তো নেই। এমনকী রোগীরা (বিশেষ করে শহুরে রোগীরা) আবার এককাঠি উপরে। আগে টেস্ট করিয়ে তবে ডাক্তার দেখাতে আসেন। টেস্ট না লিখলে অসন্তুষ্ট হন। ভাবেন ডাক্তারকে দেখানোর পয়সা উশুল হল না।

পয়সা ফেললেই সুস্বাস্থ্য পাওয়া যাবে, রোগ শরীরে ঢুকবে না এমনটা যুক্তিতে খাটে না, বাস্তবেও না। আমার শরীর যতই আমার আমার করে আলাদা করে রাখি না কেন, আমিও নিঃশ্বাস নিই এই

আমার শরীর যতই আমার আমার করে আলাদা করে রাখি না কেন, আমিও নিঃশ্বাস নিই এই দূষণের মধ্যেই। আমিও পা ফেলি এই দূষিত মাটিতেই, আমিও খাই প্যাকেটের খাবার, আমিও টানি সিগ্রেট, খাই মদ। . . . এই ‘সব’-কে বাদ দিয়ে আমার সুস্বাস্থ্য ‘আলাদা করে’ হবে না।

দূষণের মধ্যেই। আমিও পা ফেলি এই দূষিত মাটিতেই, আমিও খাই প্যাকেটের খাবার, আমিও টানি সিগ্রেট, খাই মদ। আমিও মিশে আছি সবকিছুরই সঙ্গে, আমাকে এ ‘সবে’র থেকে আলাদা করাই সম্ভব নয়। এই ‘সব’-কে বাদ দিয়ে আমার সুস্বাস্থ্য ‘আলাদা করে’ হবে না।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের সুফল যদি আমরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা করে সবটুকু নিতে চাই, তাহলে হয়তো একটা পৃথিবীর সম্পদে কুলোবে না। এমন একটা ব্যবস্থা যেখানে চিকিৎসা “truly personalized” অর্থাৎ কিনা সবার জন্যে আলাদা আলাদা সেখানে কেউ হয়তো ব্রেন ডেড হয়েও বছর বছর ভেন্টিলেটরে ‘বিজ্ঞানের পরিভাষা অনুযায়ী জীবিত’ থাকার সুযোগ পায়, আবার কেউ খাবারে ন্যূনতম প্রোটিনের দীর্ঘকালীন অভাবজনিত অপুষ্টিতে মারা যায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারাও সেই দিকেই বহমান। একের জন্যে, একার জন্যে।

রিডাকশনিস্ট বিজ্ঞানই তাই। বা বর্তমান সময়ের প্রভাবশালী বিজ্ঞান হয়তো রিডাকশনিস্টই। এক থেকে আরও ভেতরে ভেতরে ঢুকে আরও ছোটো ছোটো করে দেখা। দেহ থেকে অঙ্গ, তন্ত্র, কলা কোষ, জিন হয়ে আরও গভীর যাত্রাই বিজ্ঞানীর স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু উলটোপথে উঠে এসে একক মানুষের উপরে উঠে অনেক মানুষের স্বার্থ, বা আরও খানিকটা উপরে উঠে না-মানুষদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের স্বার্থের কথা ভাবা আমাদের ভাবনা ও চর্চার কাঠামোর বাইরে। রাজাদার দোষ নেই, মানুষ তো চাইবেই বাওয়া! আধুনিক চিকিৎসা যত উন্নত হয়েছে মানুষের মৃত্যু, রোগকে মেনে নেওয়ার ক্ষমতা ততই কমেছে। কাজেই যেকোনো কারণে রোগী মরে গেলেই সেটা যেন অস্বাভাবিক। প্যাঁদাও ডাক্তার নার্সকে, করো ভাঙচুর। মেডিক্যাল কলেজে দেখেছি সন্ধ্যেয় মরে যাওয়া বাচ্চাকে মাঝরাত পর্যন্ত ব্যাগ মাস্ক দিয়ে পাম্প করে যাচ্ছেন মা, একই দিনে বেশি শিশুমৃত্যুর কাউন্ট দিলেই হুলুস্থুলু পড়ে যাবে বলে, ভোরবেলা মিডিয়া দৌড়ে আসবে বলে। 'মানুষ যেন অমর ছিল আগে, ডাক্তারই মেরেছে সম্প্রতি'। ওষুধ, ইমেজিং, ল্যাব টেস্ট ইত্যাদি কোম্পানিরা এখন চিকিৎসাবিজ্ঞানের অত্যাধুনিক অসহ্য অগ্রগতির আসল ফান্ডিং এজেন্সি। নতুন নতুন ওষুধ, নতুন নতুন টেস্ট কোটি কোটি টাকা খরচের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়ে বাজারে আসছে, সবাই হয়তো তার সুযোগও পাবে না। এর যতটা না উদ্দেশ্য পৃথিবীতে প্রজাতি হিসেবে মানুষকে সুস্থিত করা, তার চেয়ে ওষুধ কোম্পানির ব্যাবসার ক্ষেত্র বাড়ানো আরও বড়ো উদ্দেশ্য। "A pill for every ill" আধুনিক চিকিৎসার মূল দার্শনিক ফান্ডা। সব রোগ যে সারানো যাবে না, সব কষ্ট যে কমানো যাবে না, রোগ মৃত্যু দুঃখ ছাড়া যে জীবন হবে না সেটা বলা মানে উদ্যত 'গু'-এর সামনে মাথা পেতে দেওয়া। "আসলে কিন্তু উলটো, এবং অবৈজ্ঞানিক, মানসিকতাটাও একইসাথে সমান তালে বেড়ে চলেছে . . 'an ill for every pill'।" স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অপূর্ব, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষদের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত।

Advt.

সবার জন্য স্বাস্থ্য সম্ভব?

কেন্দ্র সরকারের কমিটি বলছে

সম্ভব

সরকার বলছে

অসম্ভব

আমরা বলছি

সবার জন্য স্বাস্থ্য চাই।

আপনি?

'সবার জন্য স্বাস্থ্য' প্রচার কমিটি

এক ডাক্তার ও এক যোগী

অহনা মল্লিক

আমাদের দেশে সব থেকে বড়ো রাজ্য হল উত্তরপ্রদেশ। সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী একজন যোগী। যোগী আদিত্যনাথ। মুখ্যমন্ত্রী হবার আগে তিনি ছিলেন গোরখপুর নির্বাচন কেন্দ্রের এমপি। একবার নয়, পরপর পাঁচবার এই কেন্দ্র থেকে তিনি ভোটে জিতে এমপি হন। তার ওপর তিনি গোরখনাথ মঠের পীঠাধিশ্বর। এক কথায়, তিনি উত্তরপ্রদেশের সব থেকে বেশি ক্ষমতাবান মানুষ, আর গোরখপুর হল তাঁর খাসতালুক।

এ-হেন গোরখপুরের একটি হাসপাতাল হল বাবা রাঘব দাস মেডিক্যাল কলেজ, সংক্ষেপে বিআরডি মেডিক্যাল কলেজ। তার শিশুবিভাগে ২০১৭ সালের প্রথম সাত মাসে শিশু ভর্তি হয় ৩৮৭৮ জন, মারা যায় ৫৯৬, শতকরা পনেরো শতাংশ। আর সদ্যোজাতদের জন্যে বিশেষ আইসিইউ (এনআইসিইউ)-তে ভর্তির সংখ্যা ২৩৮৬, মৃতের সংখ্যা ৯৩১, প্রায় চল্লিশ শতাংশ। এই মৃত্যুহার খুবই বেশি। আর মিডিয়ার কল্যাণে সবাই জেনে গেছে, হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহ ঠিক না থাকার ফলেই এই অতিরিক্ত মৃত্যু।

কিন্তু অক্সিজেন-জাতীয় তুচ্ছ ব্যাপারের জন্য তো আর মুখ্যমন্ত্রীজি বা তাঁর সহকর্মী মন্ত্রীরা দায়ী হতে পারেন না। লালবাহাদুর বলে কে একজন বোকা লোক সেই কবে ট্রেন দুর্ঘটনার দায় নিজের কাঁধে নিয়ে রেলমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তো আর যোগীজির মতন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না! সুতরাং মৃত্যুর দেবতাকে জিভ কেটে জারা হটকে যেতে হল, এবং নতুন হিসেবে শিশুমৃত্যুর হার কমে গেল বেশ কিছুটা। তবু সেই হারটাও যে বড্ড বেশি! যোগীজি যেহেতু দায়ী নন, দায়ী করার মতো কাউকে পাওয়া বিষম দরকার যে!

পেতে অসুবিধা হল না। সম্প্রতি ডাক্তারদের সময় ভালো যাচ্ছে না, জনগণ নানা কারণে তাদের ওপর একটু খাপ্পা হয়েই আছেন, তাদের মধ্যে একটা মনোমত নামও পাওয়া গেল। ডাক্তার কাফীল খান।

একটু গোড়ার কথায় আসা যাক।

সরকারি এই হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহের দায়িত্বে ছিল পুষ্পা সেলস বলে এক কোম্পানি। তাঁরা ব্যাবসা করেন, আর পয়সা না-পেলে ব্যাবসা চলে না। ২০১৬-র অক্টোবর থেকে তাঁরা বকেয়া মেটানোর দাবিতে তাগাদা দিচ্ছেন, কিন্তু মাঝেমধ্যে ছিটেফোঁটার বেশি মেলে না। বকেয়ার পরিমাণ বাড়তে থাকে। শেষে বাধ্য হয়েই ২০১৭-র মার্চ থেকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে লাগাতার তাগাদা, সরবরাহ বন্ধের হুমকি দিয়ে চিঠি, এমনকী আইনি নোটিশ দিল পুষ্পা সেলস। লাভ হল না। মার্চ-এপ্রিল-মে-জুন-জুলাই পেরিয়ে আগস্ট মাস। সরকার অক্সিজেনের বিল মেটাল না।

অন্যদিকে, মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল এবং আরও কিছু আধিকারিকের হাতে মেডিক্যাল কলেজ আর হাসপাতাল পরিচালনার ভার। কিন্তু সরকার টাকা না দিলে তাঁরা পুষ্পা সেলস-এর পাওনা মেটান কী দিয়ে? তাগাদায় হাসপাতাল-পরিচালকদের জীবন অতিষ্ঠ—সমস্যার কথা তাঁরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান, কিন্তু সুরাহা হয় না।

একেবারে কিছু হয় না, বলা যাবে না। ২০১৭-র জুন-জুলাই মাস নাগাদ সরকার মেডিক্যাল কলেজে টাকা পাঠালেন, কিন্তু তার সঙ্গের নির্দেশিকায় বলা হল, পুরোনো কোনো বকেয়া মেটানোর কাজে এই অর্থ খরচ করা যাবে না, এই টাকা শুধুমাত্র আগামী দিনের খরচের জন্যেই। অতএব পুষ্পা সেলস-এর বকেয়া মিটল না।

গোরখপুরের সরকারি মেডিক্যাল কলেজ আর বাকি হাসপাতালের বেহাল দশা আর এনকেফেলাইটিসের বাড়বাড়ন্তের সময় চিকিৎসার অব্যবস্থা নিয়ে ৩১ জুলাই, ২০১৭ ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় তুমুল আলোচনা। তখনও কিন্তু অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের সমস্যা শুরু হয়নি, এত শিশুমৃত্যুও ঘটেনি। সেই আলোচনায় শিশুরোগ বিভাগের অন্যতম চিকিৎসক ডা. কাফীল খান জানান, হাজারো সমস্যা আছে বটে, কিন্তু তাঁরা শিশুদের বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। ৪ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে বিআরডি মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের কাছ থেকে মেডিক্যাল শিক্ষার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে একই বিষয়ে যাওয়া সাত-আটটি চিঠির শেষটি পৌঁছায়। এটিতে প্রিন্সিপাল জানান, অনেক নিষ্ফলা চিঠির পর অক্সিজেন সরবরাহের সংস্থা অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ করেছেন। সঞ্চয়ে যেটুকু অক্সিজেন আছে তা শেষ হয়ে আসছে। প্রিন্সিপালের আর্তি—কিছু করুন!

৯ আগস্ট, ২০১৭ বিআরডি মেডিক্যাল কলেজে যোগী আদিত্যনাথ স্বয়ং এলেন হাসপাতাল পরিদর্শনে। এলেন, দেখলেন এবং যোগীজির এক কথায় ব্যবস্থা হয়ে গেল। ১১ তারিখ টাকা পৌঁছল অক্সিজেন সরবরাহকারী কোম্পানির অ্যাকাউন্টে। কিন্তু ততক্ষণে বড়ো দেরি হয়ে গিয়েছে। কেননা তার আগের দিন রাত্রেই ঘটে যাবে গণ মৃত্যু, মূলত শিশু ও কিছু প্রাপ্তবয়স্কেরও।

হাসপাতালে মূল অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা ছিল পাইপলাইনে

করে তরল অবস্থায় অক্সিজেন দেওয়া, বা সেন্ট্রাল লাইনে অক্সিজেন সরবরাহ। ১০ আগস্ট ২০১৭, ডা. কাফীল খান ছুটিতে ছিলেন। রাত্রে শিশুবিভাগের চিকিৎসকদের নিজস্ব হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জানতে পারেন, সেন্ট্রাল লাইন দিয়ে শিশুদের কাছে পৌঁছোনো অক্সিজেন কমে আসছে। হাসপাতালে মজুত কয়েকটি সিলিন্ডার আছে বটে, কিন্তু সেই সিলিন্ডারের সংখ্যা মাত্র ৫২টি—তা দিয়ে অজস্র প্রাণের ক-টি আর বাঁচবে?

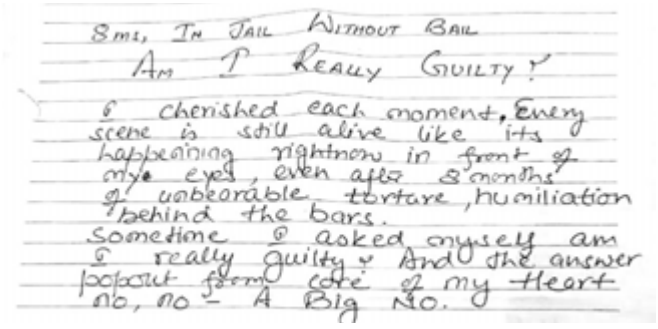
Sms, In Jail Without Bail
Am I Really Guilty?
I cherished each moment, Every scene is still alive like its happening rightnow in front of my eyes, even after 8 months of unbearable torture, humiliation behind the bars.
Sometime I asked myself am I really guilty? And the answer popout from core of my Heart no, no - A Big No.

চিত্র ১. জেল থেকে লেখা ডা. কাফীল খানের চিঠির অংশ

এর পর? এরপর পড়ুন ডা. কাফীলের জেল থেকে লেখা চিঠিতে। "জেলে আট মাস, জামিন মেলেনি, আমি কি সত্যিই অপরাধী? আমি প্রতিটি মুহূর্ত যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি আমার চোখের সামনে, এই আট মাসের অসহ্য অত্যাচার আর জেলে কাটানোর অপমানের পরেও। আমি এখন মাঝেমধ্যে নিজেকে প্রশ্ন করি, আমি কি সত্যিই অপরাধী? আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আমি শুনতে পাই তার উত্তর, "না, না, কোনোমতেই নয়।"

২০১৭ সালের ১০ আগস্ট। সেই স্মরণীয় রাত্রে আমি যে মুহূর্তে আমার ফোনে সেই হোয়াটসঅ্যাপ বার্তাটি পাই তখন থেকে আমি শুধু সেই কাজটাই করেছি যা কিনা একজন চিকিৎসক, একজন পিতা, ভারতের এক দায়িত্বশীল নাগরিকের করার কথা। হঠাৎ পাইপে-আসা অক্সিজেন সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবার পরে আমার পক্ষে যতজন শিশুর জীবন বাঁচানো সম্ভব ছিল আমি তা বাঁচানোর চেষ্টা করেছি। যত নিষ্পাপ শিশু সেদিন অক্সিজেন না-পেয়ে মারা যাচ্ছিল তাদের জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।

আমি পাগলের মতো সব্বাইকে ডেকেছি, আমি তাদের কাছে যেন ভিক্ষা করেছি, আমি সবার সঙ্গে কথা বলেছি। আমি দৌড়েছি, চেঁচিয়েছি, গাড়ি চালিয়ে গেছি, যাদের আদেশ দেবার তাদের আদেশ দিয়েছি, গলা ফাটিয়েছি; রোগীর আত্মীয়স্বজনদের সান্ত্বনা দিয়েছি, কথা বলেছি তাঁদের যন্ত্রণা কমাতে। একজন মানুষের যা করা সম্ভব সবই করেছি সেইদিন।

আমি আমার বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে, আমার মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে, ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপালের সঙ্গে,

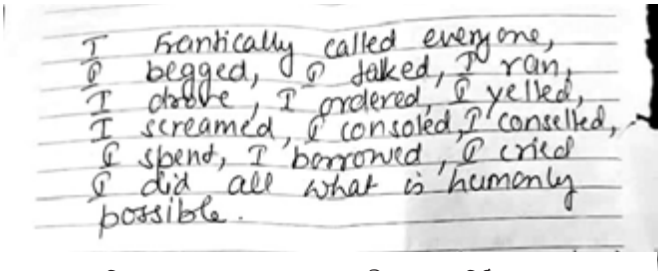
I frantically called everyone, I begged, I talked, I ran, I drove, I ordered, I yelled, I screamed, I consoled, I conselled, I spend, I borrowed, I cried I did all what is humanly possible.

চিত্র ২. জেল থেকে লেখা ডা. কাফীল খানের চিঠির অংশ

গোরখপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে, গোরখপুরের অ্যাডিশনাল ডিরেকটর (স্বাস্থ্য)-র সঙ্গে, কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল স্টোর সুপারিন্টেন্ডেন্ট-ইন-চার্জ-এর সঙ্গে [ফোনে] কথা বলেছি, তাঁদের বলেছি আচমকা পাইপে-আসা তরল অক্সিজেন সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গিয়ে কী ভয়াবহ অবস্থা হয়েছে, বলেছি যে শিশুগুলি কী ভয়ানক বিপদে আছে (আমার কাছে এই সব ফোনের কথাবার্তা রেকর্ড করাও আছে)।

আমি গ্যাস সাপ্লাইকারী 'মোদী গ্যাস', 'বালাজি', 'ইম্পেরিয়াল গ্যাস', 'ময়ূর গ্যাস এজেন্সি'-এদের কাছে, গোরখপুরে আমাদের হাসপাতাল বাবা রাঘব দাস মেডিক্যাল কলেজ-এর কাছে যেসব হাসপাতাল আছে তাদের কাছে, ফোন নম্বর জোগাড় করে [অক্সিজেন] ভিক্ষা চেয়েছি। কয়েকটি জাম্বো অক্সিজেন সিলিন্ডার পেয়েছিলাম যা দিয়ে কয়েকজন নিষ্পাপ শিশুর জীবন বাঁচানো সম্ভব—সেগুলোর দাম আমি তখনই নগদে মিটিয়ে দিয়েছি, তাদের বলেছি আরও সিলিন্ডার দিলে তার দামও তারা তখনই পেয়ে যাবে।

পাইপে-আসা তরল অক্সিজেন যতদিন না এসেছে আমরা দিনে ২৫০-টি সিলিন্ডার এভাবে জোগাড় করেছি, এই জাম্বো সিলিন্ডারের একটার দাম ২১৬ টাকা।

আমি অফিসের একটা কুঠুরি থেকে আরেকটায় দৌড়েছি। হাসপাতালের ১০০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ইমার্জেন্সির ১২ নম্বর ওয়ার্ডে দৌড়েছি। অক্সিজেন সিলিন্ডার যেখান থেকে সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছিল সেখান থেকে যেখানে অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণ হয়, সেখানে দৌড়েছি যাতে অক্সিজেন ঠিকঠাক পৌঁছোয়।

আমি নিজের গাড়ি করে কাছাকাছি হাসপাতালগুলোতে গিয়ে সিলিন্ডার এনেছি। যখন দেখেছি এতে কুলোবে না, আমি নিজে গাড়ি চালিয়ে এসএসবি [সুরক্ষা সীমা বল]-তে গিয়ে এসএসবি-র ডিআইজি-র সঙ্গে দেখা করে এই অভূতপূর্ব অবস্থার কথা জানিয়েছি। তাঁরা খুব দ্রুত অক্সিজেন আনার জন্য একটা বড়ো লরি ও একদল সৈনিক দিয়ে সাহায্য করেছেন যাতে বিআরডি

হাসপাতাল থেকে খালি সিলিন্ডারগুলো গ্যাস এজেন্সি-র কাছে এনে সেগুলো ভর্তি করে বিআরডি হাসপাতালে আনা যায়, ও আবার সেগুলো এজেন্সিতে ভর্তি করার জন্য ফেরত নেওয়া যায়। তাঁরা একটানা ৪৮ ঘণ্টা এ-কাজ করে গেছেন। তাঁদের উৎসাহ আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি এসএসবি-কে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। জয় হিন্দ।

আমি আমার জুনিয়ার ও সিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলেছি আর আমার বিভাগের কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছি—"আতঙ্ক ছড়াবেন না, ভেঙে পড়বেন না, বাচ্চাদের বাবা-মায়েদের বিক্ষোভ দেখে রেগে যাবেন না, আর কাজ থামাবেন না। প্রতিটি জীবন বাঁচানোর জন্য আমাদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।"

আমি শিশুহারা বাবা-মায়েদের সান্ত্বনা দিয়েছি, আর যেসব বাবা-মায়েরা সন্তান হারিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন তাঁদের শান্ত করার চেষ্টা করেছি। আমি তাঁদের বলেছি, পাইপে-আসা তরল অক্সিজেন নেই, আমরা জাম্বো অক্সিজেন সিলিন্ডার দিয়ে কাজ চালানোর চেষ্টা করছি।

আমি সবার কাছে চেঁচিয়ে বলেছি, বাচ্চাগুলোকে বাঁচাতেই হবে। আমাদের প্রশাসন অক্সিজেন সাপ্লায়ারদের প্রাপ্য টাকা না দেবার ফলে এই যে ভয়ানক ব্যাপারটা ঘটল সেটা বুঝে আমি আর আমাদের টিমের সবাই কেঁদে ফেলেছিলাম। ১৩ আগস্ট ভোর দেড়টা নাগাদ তরল অক্সিজেন ট্যাঙ্কে করে আসার আগে পর্যন্ত আমরা আমাদের চেষ্টায় বিরতি দিইনি।

কিন্তু ১৩ তারিখ সকালে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যোগীজি মহারাজ আসার পর আমার জীবন যেন বিধ্বস্ত হয়ে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমিই সেই সিলিন্ডার জোগাড় করা ডাক্তার কাফীল? আমি বললাম, হ্যাঁ, স্যার। তিনি রেগে গেলেন—তুমি ভেবেছ সিলিন্ডারের ব্যবস্থা করে হিরো হবে? দাঁড়াও, আমি দেখছি।

যোগীজি রেগে গেছিলেন—কী করে এই ঘটনাটা মিডিয়ার লোক জানতে পারল? আমি আল্লার নামে শপথ করে বলছি, আমি সে রাতে কোনো মিডিয়ার লোককে খবর দিইনি। তারা সেখানে আগে থেকেই ছিল।

তারপর থেকে আমার বাড়িতে পুলিশ আসতে শুরু করল—তারা চিৎকার করত, ভয় দেখাত, আর আমার পরিবারের লোকেদের ওপর অত্যাচার করত। লোকজন আমাকে সাবধান করতে লাগল যে এবার তারা আমাকে 'এনকাউন্টার'-এর নামে মেরেই ফেলবে। আমার পরিবার, আমার মা, আমার স্ত্রী, সন্তান—এরা যে কতটা ভয় পেয়েছিলেন তা বলার ভাষা আমার জানা নেই। পরিবারকে অপমান আর কষ্ট থেকে বাঁচাতে আমি থানায় আত্মসমর্পণ করলাম। ভেবেছিলাম, আমি যখন কোনো দোষ করিনি আমি সুবিচার পাব।

কিন্তু তা হয়নি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেল, ২০১৭-র আগস্ট থেকে ২০১৮-র এপ্রিল। হোলি উৎসব এল আর গেল, দশেরা চলে গেল, ক্রিসমাস কেটে গেল, নববর্ষও এল, দিওয়ালি গেল—প্রত্যেক দিন আমি আশা করে গেছি এবার জামিন অন্তত পাব। তারপর আমরা বুঝলাম বিচারকরাও চাপে আছেন (এমনকী তাঁরা সেটা বলেছেনও)।

আমাকে এখন জেলে ১৫০-জন বন্দি দিয়ে ঠাসা এক ব্যারাকের মেঝেতে শুতে হচ্ছে, রাত্রে লক্ষ লক্ষ মশা আর দিনে হাজার হাজার মাছি। জেলের খাদ্য কোনোমতে গিলে নিই বেঁচে থাকার জন্য। স্নান আধা-উলঙ্গ হয়ে মাঠের ভেতর আর মলত্যাগ দরজা-ভাঙা এক টয়লেটে। রবিবার, মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার বাড়ির লোক দেখা করতে আসার জন্য অসহ প্রতীক্ষা।

খালি আমার কাছেই নয়, আমার গোটা পরিবারের পক্ষেও বেঁচে থাকাটা দুঃসহ নরকযন্ত্রণা। তারা একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় সুবিচারের আশায় ছোটাছুটি করছে—থানা থেকে আদালত, গোরখপুর থেকে এলাহাবাদ। সুবিচার কোথাও নেই। আমার মেয়ের একবছর সাত মাস বয়স, তার প্রথম জন্মদিনেও আমি থাকতে পারিনি। আমি শিশুবিশেষজ্ঞ, আর আমার কাছে নিজের শিশুকে বড়ো হতে দেখতে না-পাওয়া দুঃসহ কষ্টের। আমি শিশুবিশেষজ্ঞ হিসেবে কতজনকে বাচ্চা বড়ো হবার মাইলফলকগুলো বুঝিয়ে বলেছি, আর আমার বাচ্চা কবে হাঁটতে শিখল, কথা বলল, হাসল সেটা দেখার সুযোগ হল না আমার।

তাই এখনও এই প্রশ্ন আমাকে তাড়া করে, সত্যিই কি আমি অপরাধী? উত্তর হল, না, না, কোনোমতেই নই। আমি ১০ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ছুটিতে ছিলাম। শিশুচিকিৎসা বিভাগের প্রধান সেই ছুটি মঞ্জুর করেছিলেন। তবু আমি ডিউটি করতে ছুটে গেছিলাম—এটাই কি আমার অপরাধ? আমি, বিআরডি হাসপাতালের ভাইস চ্যান্সেলর, ওয়ার্ড নম্বর ১০০-র ডাক্তার—এদের অপরাধী বলা হল। আমি তো সবথেকে জুনিয়ার ডাক্তার, চাকরিতে স্থায়ী পদে যোগ দিয়েছি ২০১৬-র ৮ আগস্ট। আমি জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন-এর নোডাল অফিসার ছিলাম, আর শিশুচিকিৎসা বিভাগের লেকচারার হিসেবে আমার কাজ ছিল ছাত্র পড়ানো আর বাচ্চাদের চিকিৎসা করা। আমি হাসপাতালের তরফে তরল অক্সিজেন কেনা, টেন্ডার দেখা, তার সাপ্লাই ও টাকাপয়সা ঠিকঠাক দেওয়া হচ্ছে কিনা সে সব দেখার দায়িত্বে কোনমতেই ছিলাম না। যদি পুষ্পা সেলস কোম্পানি আমাদের

হাসপাতালে তরল অক্সিজেন সাপ্লাই বন্ধ করে দেয় তার দায় আমার কী করে হতে পারে? একজন সাধারণ মানুষও বুঝতে পারবে যে, ডাক্তারের কাজ অক্সিজেন কেনা নয়, রোগীকে দেখা।

প্রকৃত দোষী হলেন গোরখপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মেডিক্যাল এডুকেশন-এর ডাইরেক্টর জেনারেল, হেলথ/শিক্ষা বিভাগের প্রধান সচিব—পুষ্পা সেলস কোম্পানি ১৪ বার তাদের ৬৮ লক্ষ টাকা পাওনা নিয়ে চিঠি লিখলে এঁরা কিচ্ছু করেননি। উচ্চপর্যায়ে এই প্রশাসনিক গাফিলতি ঘটেছে। তাঁরা অবস্থার গুরুত্ব বোঝেননি। তারপর নিজেদের পিঠ বাঁচাতে আমাদের বলির পাঁঠা করেছেন। যখন মণীশ জামিন পেলেন, তখন আমরা কিছুটা আশার আলো দেখলাম—এবার আমাদেরও ন্যায়বিচার হবে, আমিও বেরিয়ে পরিবারের সঙ্গে থাকতে পারব, মানুষের সেবা করতে পারব। কিন্তু তা হয়নি। আমরা এখনও অপেক্ষা করছি।

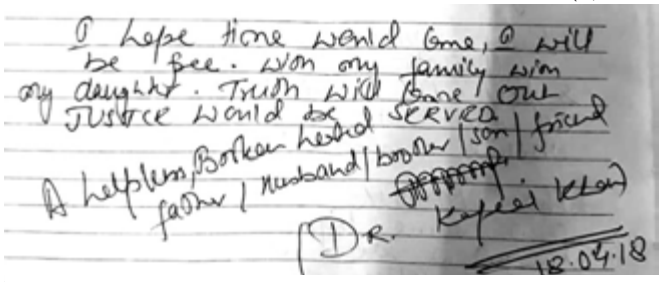

সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন, জামিন পাওয়া হল অধিকার, জেলে থাকা ব্যতিক্রম-মাত্র। আমাদের অবস্থা হল ন্যায়বিচার ভূলুণ্ঠিত

চিত্র ৩. জেল থেকে লেখা ডা. কাফীল খানের চিঠির শেষাংশ

হবার ধ্রুপদী উদাহরণ। আমি আশা করি একটা সময় আসবে যখন আমি মুক্ত হব, আমার পরিবার ও বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে থাকতে পারব। সত্য প্রকাশ পাবে। ন্যায়বিচার হবে।

—এক অসহায়, ভগ্নহৃদয় পিতা, স্বামী, ভাই, পুত্র ও বন্ধু ডা. কাফীল খান। ১৮ এপ্রিল, ২০১৮।

ডাক্তার কাফীল খানের জেল থেকে লেখা এই চিঠিটি কাফীলের স্ত্রী শাবিস্তা ২১ এপ্রিল প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়া-য় সাংবাদিকদের হাতে তুলে দেন।

এর পরেই, ২৫ এপ্রিল ২০১৮, ঘটনাচক্রেই হোক বা অন্য কোনো কারণে, ডা. কাফীলের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন। এই লেখাটি লেখার সময় ডা. কাফীল জামিনে মুক্ত। সাত মাসের ওপর জেল খেটেছেন এই ডাক্তার। তাঁর ছ-টি জামিনের আবেদন এর আগে নাকচ হয়ে গেছে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি এই জামিন দেবার সময় বলেন, চার্জশিট দেওয়া হয়ে গেছে, তদন্তের কাজে বাধা দেওয়া আর সম্ভব নয়, তাই জামিন দেওয়া হল। উল্লেখ করা যেতে পারে দুর্নীতি ও প্রাইভেট প্র্যাকটিসের যে অভিযোগ পুলিশ করেছিল সেগুলো তারা এর আগেই তুলে নিয়েছে।

অন্যদিকে, এলাহাবাদ হাইকোর্ট ৩০ এপ্রিল ২০১৮ ডা. রাজীব মিশ্র-কে জামিন দেয়নি। ডা. রাজীব মিশ্র ছিলেন ওই বাবা রাঘব দাস মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হল দুর্নীতির, তিনি নাকি ঘুষের জন্য পুষ্পা সেলস-এর প্রাপ্য টাকা আটকে দিয়েছিলেন। তার ফলে অতগুলো শিশু প্রাণ হারায়, তাই তাঁর ওপর ইচ্ছাকৃত কাজের জন্য মানুষের প্রাণহানির (culpable homicide) ও অপরাধমূলক চক্রান্তের অভিযোগও আছে। ডা. রাজীব মিশ্র-র ডায়াবেটিস ও লিভারের রোগ আছে, জেলে তাঁর চিকিৎসা ঠিকঠাক হচ্ছে না বলে তিনি জামিনের আবেদনে জানিয়েছিলেন। আর এক অভিযুক্ত ডা. রাজীব মিশ্রর স্ত্রী, ডা. পূর্ণিমা শুক্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি হাসপাতালে দুর্নীতিচক্রের মুখ্য হোতা। তাঁর হাড় ফেটে গেছে (hairline fracture) এবং তাঁরও জামিন মেলেনি। জেলে আছেন ডা. সতীশ, অ্যানাস্থেসিয়া বিভাগের প্রধান হিসেবে যাঁর হাসপাতালের অক্সিজেন সাপ্লাই দেখার দায়িত্ব ছিল। উল্লেখ্য হল, রাজ্য সরকারের যেসব উচ্চপদস্থ আমলা টাকা পাঠানোর দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো মামলাই করেনি। আর এই ডাক্তারদের বিরুদ্ধে মামলার শুনানি আটমাস ধরেও শেষ হচ্ছে না, তাঁদের জেলের বাইরে পর্যন্ত আসতে দেওয়া হচ্ছে না।

প্রিন্সিপাল ও ডাক্তাররা আমলাতন্ত্রের বাইরের লোক, তাঁরা দোষী সাব্যস্ত হলে আমলাদের গায়ে কাদা লাগবে না, ও আমলাদের প্রত্যক্ষ উপরওয়ালা মন্ত্রীমণ্ডলীও বেকসুর প্রমাণিত হয়ে যাবেন। মজার ব্যাপার হল, যেসব আমলা এই মামলাটি সাজিয়েছেন, তাঁদের সবার অতীতের রেকর্ড ভালো নয়। স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে বিভাগীয় তদন্তের নেতৃত্বে ছিলেন ডা. কে কে গুপ্তা, যিনি দুর্নীতি আর তেমন ধরণের অভিযোগে স্বয়ং চাকরি খুইয়েছিলেন বছরকয়েক আগেই। পুলিশের কাছে এফআইআর দাখিল করেন স্বাস্থ্যবিভাগের ডিজি সেই কে কে গুপ্তা-ই।

ডা. কাফীলের এই অবস্থা হবার পরে আমাদের মতো অনেক ডাক্তারই ভাবছেন, ডাক্তারের দায়িত্ব তাহলে কী? রোগীর প্রেসক্রিপশন লিখে চলে যাওয়া? রোগী মরছে নিশ্চিত জেনেও মুখ ফিরিয়ে নেওয়া?

আর, আমাদের দেশনেতাদেরই বা দায়িত্ব কী? স্বাস্থ্যের বৃত্তে

তথ্যসূত্র: *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস* (আন্তর্জালে http://indianexpress.com/article/india/gorakhpur-doctor-writes-from-jail-made-scape-goat-for-administrative-failure-5146890/ ২৫ জুলাই ২০১৮ দেখা)।

ইন্ডিয়া টুডে (আন্তর্জালে https://www.indiatoday.in/india/story/ex-principal-of-gorakhpur-s-brd-medical-college-denied-bail-by-allaabad-hc-1223789-2018-05-01 ১ মে ২০১৮ দেখা)।

লেখক প্রাবন্ধিক।

সেবাব্রতী চিকিৎসক, আইনের মারপ্যাঁচ ও আত্মঘাতী ঔদাসীন্য

ডা. জয়ন্ত দাস

এবছর মার্চ মাসে ডা. রাতুল বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাঝরাত্রিতে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ। ইউএপিএ বলে একটা আইন হয়েছে, সেই আইনের ঘোষিত উদ্দেশ্য হল সন্ত্রাসবাদ ঠেকানো। রাতুল নাকি সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম করছিলেন! আশ্চর্য হল, ইউএপিএ আইনে তাঁর নামে মামলা হবার পরে বহুদিন পর্যন্ত 'সন্ত্রাসবাদী' রাতুল দিব্যি সবার সামনে ঘুরছিলেন, তাঁর বাড়িতে থাকছিলেন, ডাক্তারি করছিলেন। হঠাৎ গভীর রাত্রে তাঁর বাড়িতে হানা দিয়ে ধরার কুনাট্যটি করার কোনো কারণই ছিল না।

প্রসঙ্গত, প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই ইউএপিএ আইনের বিরোধিতা করেছেন 'অগণতান্ত্রিক' বলে। কিন্তু হায়, বিরোধিতাটা করা হয়েছে তখনই যখন সেই দল ক্ষমতায় নেই। যখন দল ক্ষমতায়, তখন ইউএপিএ আইনের বলে রাজনৈতিক বিরোধীপক্ষকে জেলে ঢোকাতে কেউ কসুর করেনি। এই আইনে প্রায় যেকোনো কাজকে সন্ত্রাসবাদী বলা যায়। যদি এমন কোনো কাগজ আপনার কাছে পাওয়া যায় (বা আপনার কাছে পাওয়া গেছে বলে পুলিশ দাবি করে, যেটা আপনার পক্ষে অপ্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব) যা সন্ত্রাসবাদী কাজের সঙ্গে যুক্ত ভাবা যেতে পারে, তাহলেই আপনাকে এই আইনবলে 'সন্ত্রাসবাদী' বলা যায়। আপনি যদি স্রেফ অ্যাকাডেমিক উদ্দেশ্যে সেই কাগজ রেখে থাকেন তাও আপনার রেহাই নেই। আর কোর্টে গিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা ভারী শক্ত, কেননা এই আইনে চার্জশিট না-দিয়েই ১৮০ দিন বন্দি করে রাখা যায়, আর পুলিশ নিজের কাস্টডি-তে ৩০ দিন ধরে রাখতে পারে। রাতুল অবশ্য ৩০ এপ্রিল ইউএপিএ-ধারায় জামিন পেয়েছেন, যেটা বেশ কঠিন কাজ। কিন্তু আরও কিছু ধারায় পুলিশি মামলা লাগু আছে, এবং তিনি আজকের লেখাটির সময় পর্যন্ত জেলেই আছেন।

কিন্তু রাতুল কী এমন করেছিলেন যে তাঁকে সরকার এই দানবীয় আইনে গ্রেপ্তার করল? তিনি ছিলেন ডাক্তার, এবং ভাঙ্গড় বলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটি অঞ্চলে চাষিদের কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলনের অংশীদার ছিলেন। সরকার ও শাসক দলের একটি অংশ সেখানে আন্দোলনকারীদের চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত করছিলেন, তাই রাতুল সেখানকার মানুষদের দলমত নির্বিশেষে চিকিৎসা করছিলেন। এটা চিকিৎসকদের আদর্শ, এটা রেডক্রসের আদর্শ।

এখানে ভাঙ্গড় আন্দোলন নিয়ে দু-একটা কথা বলা দরকার। ভাঙ্গড়ে সরকার চাষিদের জমি নিয়ে 'পাওয়ার গ্রিড' বানানোর চেষ্টা করছিলেন। চাষিরা সেই জমি দিতে চায়নি। এপর্যন্ত গল্পটা পরিচিত, নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরে ঠিক এমন ঘটনাই ঘটেছিল বামফ্রন্ট সরকারের আমলে, ও শেষপর্যন্ত চাষিরা জমি দেয়নি, ও অনেকটা সেই জমি-আন্দোলনের ফলে বাম সরকারের পতন ঘটে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস দল সেই জমি-আন্দোলনে চাষিদের পক্ষে ছিল, ও ক্ষমতায় এসে তাঁরা চাষির দাবি বিবেচনা করবেন, এমনই আশা ছিল। প্রকৃতপক্ষে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ভাঙ্গড়ে 'অনিচ্ছুক চাষির জমি নেওয়া হবে না, দরকার হলে পাওয়ার গ্রিড প্রকল্প সরানো হবে'—এমন আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা হয়নি। অনিচ্ছুক চাষিরা ঠিক নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরের মতোই ভাঙ্গড়ে একসঙ্গে সরকার ও তৃণমূল দলের আরাবুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন সশস্ত্রবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাঁদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সমস্ত সুযোগ হাতের বাইরে চলে যায়। একজন ডাক্তার

> "আমি আমার কর্তব্য ও আমার রোগীদের মাঝখানে ধর্ম, জাতীয়তা, জাতি, দলগত রাজনীতি ও সামাজিক অবস্থানের বিবেচনাকে আসতে দেব না"।

হিসেবে রাতুল তাঁদের চিকিৎসার কাজটি করেছিলেন।

গণতন্ত্রের বদলে পুলিশিরাজ কায়েম করার আইন ইউএপিএ আইনটি বিলুপ্ত না করলে, চিকিৎসার অধিকার ও ডাক্তারদের সুমহান কর্তব্যপালন অসম্ভব হয়ে উঠবে, আমরা এই আইনের বিরুদ্ধতা করছি। এই আইনে আটক সমস্ত রাজনৈতিক বন্দি, যাঁদের 'সন্ত্রাসবাদী' তকমা দিয়ে বিভিন্ন জেলে পোরা হয়েছে, আমরা তাঁদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি করছি।

* * *

ডাক্তারদের কিছু নৈতিক কর্তব্য থাকে। একজন ডাক্তারি ছাত্র চিকিৎসক হিসেবে ছাড়পত্র পাওয়ার আগে যে শপথ নেন তাতে তাঁকে বলতে হয়, "আমি আমার কর্তব্য ও আমার রোগীদের মাঝখানে

ধর্ম, জাতীয়তা, জাতি, দলগত রাজনীতি ও সামাজিক অবস্থানের বিবেচনাকে আসতে দেব না।"[১] সব ডাক্তার এইসব নৈতিক কর্তব্য পালন করেন তা নয়, না করলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি অভিযোগও জানানো যায় না। কিন্তু সমাজ মনে করে, অন্তত এতদিন মনে করত, যে ডাক্তার তাঁর নৈতিক কর্তব্য পালন করেন, তিনিই শ্রদ্ধেয়। তিনি অন্যদের থেকে আলাদা। বর্তমানের এই ঘুণধরা সমাজের সামনে তিনি অনন্যসাধারণ, এক পবিত্র উদাহরণ। তিনি এক আশ্রয়স্থল, কেননা রোগীর জাত না দেখে, ধর্ম না দেখে, ধনী-দরিদ্র না দেখে, নীতিনিষ্ঠ ডাক্তার তার পাশে দাঁড়ান, নিজের সুবিধা-অসুবিধা তুচ্ছ করে অসুস্থর সেবা করেন। অসুস্থের জাত নেই, জাতীয়তাও নেই। অসুস্থ মানুষ যদি শত্রু হয়, যদি হয় যুদ্ধে অন্যপক্ষের সৈনিক, তাহলেও ডাক্তারের চিকিৎসার হাত থেমে থাকে না। সেই কতদিন আগে, ১৮৬৪ সালে, এমনকী মহাশক্তিশালী রাষ্ট্রও মেনে নিয়েছিল, ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করতে পারবেন, যেকোনো পক্ষের আহতদের সেবা করাই তাঁদের দায়িত্ব। মানবিকতার দায়িত্ব পালনের জন্য প্রথম জেনেভা কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয় ১৮৬৪ সালে। পরাধীন ভারতে ১৯২০ সালে ইন্ডিয়ান রেড ক্রস তৈরি হয়, তার মূল আদর্শ একই থাকে।

এই মহান আদর্শে ব্রতী হবে আমাদের চিকিৎসকদের সবাই, এটা এদেশের সব মানুষ চান। কিন্তু আশ্চর্য হল, আমাদের অভিভাবক-প্রতিম সরকারগুলো অনেক সময়েই সেটা করতে ডাক্তারদের বাধা দেন।

এই মহান আদর্শে ব্রতী হবে আমাদের চিকিৎসকদের সবাই, এটা এদেশের সব মানুষ চান। কিন্তু আশ্চর্য হল, আমাদের অভিভাবক-প্রতিম সরকারগুলো অনেক সময়েই সেটা করতে ডাক্তারদের বাধা দেন। যদিও সামনাসামনি সরকারের নেতা-নেত্রীরা চিকিৎসকদের মানুষের সেবা করতে দিবারাত্র উপদেশ দেন, কিন্তু তাঁরাই আবার কাদের সেবা হচ্ছে সে দিকে শ্যেনচক্ষু রাখেন। একদিকে তাঁরা রেডক্রস-এর নামে প্রশংসায় পঞ্চমুখ, অন্যদিকে ডাক্তার যদি রেডক্রস-এর নীতি মানতে গিয়ে সরকারের অপছন্দের লোককে সেবা করে, তাহলেই ডাক্তারকে সরকারের বিষ নজরে পড়তে হয়। না, অন্য দেশের সৈন্যদের বা ঘোষিত শত্রুপক্ষের কারও সেবা করার কথা বলছি না। এদেশেরই নাগরিক, যাঁদের চিকিৎসার সুযোগ নেই বা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাঁদের চিকিৎসা করতে যাওয়া চিকিৎসককে বারবার ক্রিমিনাল সাজানো হচ্ছে। ভাঙ্গড়ে রাতুলের ক্ষেত্রে এটা ঘটেছে, ছত্তিশগড়ে বিনায়ক সেনের ক্ষেত্রেও এটাই ঘটেছিল।

কয়েক বছর আগে ডা. বিনায়ক সেন-কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, বেশ অনেকদিন মাওবাদী তকমা দিয়ে ছত্তিশগড়ে জেলে রাখা হয়েছিল। অপরাধ? বিনায়ক মানবাধিকার কর্মী হিসেবে, এবং ডাক্তার হিসেবেও, রাজনৈতিক বন্দিদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তাঁদের মানবিক অধিকার দাবি করেছিলেন। সারা দেশ এ নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠলেও ছত্তিশগড়ের বিজেপি সরকার তাঁকে সহজে ছাড়েনি। অবশেষে আদালত তাঁকে জামিনে মুক্তির আদেশ দেন। সে সময় এ-রাজ্যে যাঁরা বর্তমানে ক্ষমতাশীল, তাঁদের নেতারা বলেছিলেন, বিনায়ককে গ্রেপ্তার অন্যায়।

আমরা চিকিৎসক হিসেবে, রেডক্রসের মহান আদর্শের শরিক হিসেবে, সমস্ত অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা পাবার অধিকার দাবি করি। কে তৃণমূল কংগ্রেস, কে সিপিএম, কে বিজেপি, আর কে কোন আন্দোলনে আছে—রোগীর চিকিৎসা করার আগে সেসব বিচার করা চিকিৎসা পেশার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। তাই আমরা ডা. রাতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি করছি।

* * *

পাশাপাশি, আমরা সাধারণ মানুষের কাছে বলতে চাই, চিকিৎসকদের অমানবিক আচরণ নিয়ে বাসে-ট্রেনে পাড়ার মোড়ে চায়ের দোকানে অনেক আলোচনা হয়। তারা অর্থ উপার্জনের যন্ত্র, মানুষের কথা ভাবে না। সামাজিক দায়িত্ব পালন করে না। এই কথাগুলো কতটা সত্যি তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। কিন্তু একবার ভেবে দেখেছেন, যদি কোনো ডাক্তার অর্থ-উপার্জনকে গুরুত্ব না দিয়ে, মানুষের জন্য ভাবে, মানুষের রোগ সারানোর জন্য নিজে বিপদ বরণ করে হাসিমুখে, তার প্রতি সমাজের কোনো কর্তব্য আছে কিনা? এক চিকিৎসকের বক্তব্য দিয়ে লেখাটি শেষ করি।

> "তাহলে ঠিক কেমন চিকিৎসক চাই আমরা? যে চিকিৎসক পেশাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত, ভালো আয় করেন, সুট-টাই পরে বড়ো গাড়িতে ঘোরেন, তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ-বিক্ষোভ যে জনমানসে প্রবল, তা গত বৎসরাধিক কালে প্রচ্ছন্ন থেকে প্রকট হয়ে উঠেছে। নিয়মিত সেই বর্গের নামি চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষোদগার, কোনো রোগীকে বাঁচাতে বা সুস্থ করতে অসমর্থ হলে তাৎক্ষণিক গ্রেপ্তারি, এমনকী গণপ্রহারের দাবি নিয়মিত দেখতে পাই। এই ক্রোধ বা অসূয়ার মানসিক বা সামাজিক ভিত্তি একরকমভাবে বোঝা যায়। তার জন্য ক্রুদ্ধ, আক্রমণাত্মক মানুষদের (আদতে, 'উপভোক্তাদের') সর্বদা দোষও দেওয়া যায় না . . . খটকা লাগে অন্যতর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সামাজিক ও সরকারি প্রতিক্রিয়া দেখলে।
>
> সমাজের ঠিক করে দেওয়া অর্থনৈতিক সাফল্যের মাপকাঠি আর জাদুকাঠিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বিত্তমুখী উন্নয়নের সম্পূর্ণ

বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেন যে কিছু সংখ্যক চিকিৎসক, তাঁদের প্রতি সমাজের তথা রাষ্ট্রের কী মনোভাব? ডাক্তারি পাশ করার পর কেউ যদি বাতানুকূল চেম্বার, পাঁচতারা হাসপাতাল, সম্ভ্রান্ত শ্বশুরকুল, বৎসরান্তে ব্যাংকক পাটায়ার মধ্যবিত্ত স্বপ্ন একেবারে গোড়াতেই পরিহার করে সচেতনভাবেই বেছে নেন অরণ্য, নাগরিক বস্তি অঞ্চল, বা দুর্যোগে দুর্গত এলাকায় ক্লিষ্ট মানুষের সেবার ব্রত, তাহলে তাঁর সেই প্রচেষ্টাকে আমরা কীভাবে নেব? কেমন আচরণ করব সেই চিকিৎসক বা মানুষটির সঙ্গে? এখনই বড়ো মুখ করে বলতে যাবেন না, মানুষ তাঁকে মাথায় করে রাখবে বা সরকার তাঁকে সম্মান দেবে। ভুল বলে

সকালের খবরের কাগজে আপনারা তাঁদের বন্দিত্ব বিষয়ক সংবাদ পড়বেন প্রাতরাশ সহযোগে, এবং বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করবেন না। হয়ত টিপ্পনী কেটে বলবেন, “নকশালী করতে গিয়ে ফেঁসেছে শালা”

ফেলবেন। আসল ঘটবে ঠিক এর বিপরীত। ধরা যাক সেই চিকিৎসকের নাম বিনায়ক সেন বা রাতুল বন্দ্যোপাধ্যায়। বাস্তবে এঁদের স্থান হবে কারাগৃহে। সকালের খবরের কাগজে আপনারা তাঁদের বন্দিত্ব বিষয়ক সংবাদ পড়বেন প্রাতরাশ সহযোগে, এবং বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করবেন না। হয়ত টিপ্পনী কেটে বলবেন, “নকশালী করতে গিয়ে ফেঁসেছে শালা”। আদৌ জানার চেষ্টা করবেন না, স্টেথোস্কোপ ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র এঁরা কখনো ধরেছেন কিনা। বোঝার চেষ্টা করবেন না, সমাজ থেকে এইসব মানুষকে সরিয়ে দিলে ব্যক্তি হিসেবে আপনার কী ক্ষতি, গণতন্ত্রের কী ক্ষতি, এমনকী শান্তিরক্ষক এবং প্রশাসকেরও কী ক্ষতি।

গোড়ার প্রশ্নটাই ফিরে আসে। তাহলে ঠিক কোন গোত্রের চিকিৎসক আমরা চাইছি? উপার্জনমনস্ক যান্ত্রিক চিকিৎসক দক্ষ হলেও তাঁকে আমাদের পছন্দ হয় না স্বাভাবিক কারণেই। আবার সেবামনস্ক নিঃস্বার্থ একনিষ্ঠ চিকিৎসক, যিনি রোগীর পাশে দাঁড়িয়ে জীবাণু থেকে অপুষ্টি, ওষুধের অপ্রতুলতা থেকে সামাজিক ন্যায়বিচারের অভাব, সবকিছুর বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত, তাঁকেও আমরা ত্যাগ অনায়াসে করি, সমবেত উদ্যোগে গণশত্রু বানাই। এমন হয় কেন? উত্তর হল, আমরা আদতে নিজেদের প্রয়োজনগুলো সম্বন্ধে সিরিয়াস নই। আমাদের মুখ ঢেকে গেছে বিজ্ঞাপনে। প্রোপাগান্ডার অধীন আমাদের বোধ।”

- ডা. কৌশিক দত্ত।[৩]

পাদটিকা

১. “I will not permit considerations of religion, nationality, race, party politics or social standing to intervene between my duty and my patient.”

২. https://thewire.in/rights/uapa-anti-terrorism-laws

৩. ডা. কৌশিক দত্ত, *চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম*, এপ্রিল ২০১৮, http://4numberplatform.com/?p=5386) স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. জয়ন্ত দাস, এমবিবিএস, এমডি, *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র অন্যতম সম্পাদক।

Advt.

‘অনীক’ পত্রিকা বিগত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। ‘অনীক’-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে--রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক, প্রযত্নে: পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা-৭০০০০৯

ফোন-৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

১৯৭৯-র ডিসেম্বরে দল্লিরাজহরার ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট হাসপাতালে চিকিৎসক ও সেবিকাদের অবহেলায় প্রাণ হারান লোহা-খনির ঠিকাদারি শ্রমিক কুসুমবাই। প্রসূতি কুসুমবাই ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘের উপাধ্যক্ষা ছিলেন। কুসুমবাইয়ের মৃত্যুতে শ্রমিকরা শপথ নেন নিজেদের এক মাতৃসদন গড়ে তোলার। শেষে মাতৃসদন নয়, গড়ে ওঠে শহীদ হাসপাতাল। আর এক বিশাল জনস্বাস্থ্য আন্দোলন।

কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

ঠিক ৩৩ বছর পর ২০১২-এর ২ ডিসেম্বর চিকিৎসকদের অবহেলায় প্রাণ যায় সাংবাদিক সন্দীপ্তা চ্যাটার্জীর। “সন্দীপ্তাকে মনে রেখে” মহিলাদের স্বাস্থ্যসচেতনতার এক প্রয়াস।

কুসুমবাই ও সন্দীপ্তা যেন এক সূত্রে বাঁধা। তাই *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকায় কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে “মেয়েদের স্বাস্থ্য ভুবন”।

মাসিকের ব্যথা—জানা-অজানা কিছু দিক

ডা. অনিন্দিতা দাস

মাথা থাকলে যেমন মাথাব্যথা হয়, তেমনভাবে যাদের ঋতুস্রাব হয় তাদের ঋতুস্রাবকালীন ব্যথাও হয়। ১১ থেকে ৪৫ বয়সের সব মেয়েরাই, বেঁটে-লম্বা, রোগা-মোটা নির্বিশেষে এই সমস্যায় পড়তে পারে, আর তাদের ৫০% শতাংশ এই অসহ্য অবস্থার মধ্য দিয়ে যায়।

মাসিকের বা ঋতুচক্রকালীন ব্যথাকে ডাক্তারি পরিভাষায় ডিসমেনোরিয়া বলে। এর ফলে তলপেটে যন্ত্রণাদায়ক খিঁচুনির মতো ব্যথা অনুভূত হয়, যা অনেকসময় কোমর আর উরু পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। আবার কখনো ব্যথা এতটা তীব্র না হয়ে শুধুমাত্র তলপেটে একঘেয়ে ব্যথার মতোও বোধ হতে পারে। মনে রাখতে হবে ঋতুচক্রের সময় সামান্য একটু ব্যথা সকলেরই হয়, তবে ডিসমেনোরিয়া আমরা তাকেই বলব যখন এই ব্যথা মেয়েদের দৈনন্দিন কাজকর্মে বাধা দেয় বা ওষুধ খেয়ে ব্যথা কমাতে হয়।

মাসিকের ব্যথার কি রকমফের আছে?

মাসিকের বেশি ব্যথা বা ডিসমেনোরিয়া-কে দু-ভাগে ভাগ করা হয়। স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় কারণে মাসিকের ব্যথা হলে তাকে প্রাইমারি ডিসমেনোরিয়া বলে। আর মাসিকের ব্যথার কারণ অন্য কোনো শারীরিক জটিলতার কারণে হলে তাহলে তাকে সেকেন্ডারি ডিসমেনোরিয়া বলে।

প্রাইমারি ডিসমেনোরিয়া কী ও কেন?

৯০-৯৫% মেয়ের ঋতুস্রাবকালীন ব্যথা প্রাইমারি ডিসমেনোরিয়া বা শারীরবৃত্তীয় কারণে মাসিকের ব্যথার গোত্রে পড়ে।

মেয়েদের জরায়ু হল তলপেটের ভেতরে অবস্থিত একটি অঙ্গ।। যখন পেটে বাচ্চা আসে, বাচ্চার প্রথম অবস্থা অর্থাৎ ভ্রূণ এই জরায়ুর মধ্যে বড়ো হয় ও পূর্ণাঙ্গ বাচ্চায় পরিণত হয়। অনেকটা উলটানো ঘড়ার মতো দেখতে এই জরায়ু সেই বাচ্চাকে ধরে রাখে, আবার বাচ্চা বড়ো হয়ে গেলে জরায়ুর পেশি সংকোচনের মাধ্যমে বাচ্চা স্ত্রী-যোনিপথে স্বাভাবিক জন্মগ্রহণ করে। তাই জরায়ুর দেয়ালটায় বেশ মজবুত ও জোরালো মাংসপেশির একটা স্তর থাকে। মাসিকের আগের প্রায় ২৮ দিন ধরে জরায়ুর মধ্যে অনিষিক্ত ডিম্বাণু জমা হয়, সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর ভেতরের গায়ের ঝিল্লিটি রক্তবাহ ও অন্য নানা নরম কোষকলা জমে পুরু হয়ে যায়। ডিম্বাণু নিষিক্ত হলে এই কোষকলা ও রক্তবাহ ভ্রূণটিকে পুষ্টি জোগাতে কাজে লাগত। কিন্তু ডিম্বাণু নিষিক্ত না হবার ফলে এই কোষকলা কোনো কাজে লাগে না, ও সেগুলো দেহ থেকে যোনিপথে দেহের বাইরে ফেলে দেবার দরকার পড়ে। এই অকেজো

. . . ডিম্বাণু নিষিক্ত না হবার ফলে এই কোষকলা কোনো কাজে লাগে না, ও সেগুলো দেহ থেকে যোনিপথে দেহের বাইরে ফেলে দেবার দরকার পড়ে। এই অকেজো জমা জিনিস বাইরে ফেলে দেওয়াটাই হল ঋতুস্রাব।

জমা জিনিস বাইরে ফেলে দেওয়াটাই হল ঋতুস্রাব। ঋতুস্রাবের সময় জরায়ুর দেওয়ালের পেশি-স্তরে সংকোচন শুরু হয়। এর ফলে পেশি-স্তরে রক্তজালিকাগুলিতে চাপ পড়ে, ফলে পেশিতে প্রয়োজনীয় রক্ত যায় না। রক্তের কাজ হল অক্সিজেন ও খাদ্যসরবরাহ করা। তাই জরায়ুর পেশি-স্তরে পুষ্টি ও শক্তি সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে মৃত পেশিকোষ থেকে কিছু রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়, এবং এই রাসায়নিকগুলি ব্যথা-উৎপাদনকারী রাসায়নিক। রাসায়নিকগুলির সাধারণ নাম প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন। এই রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতির ফলে

জরায়ুর পেশি সংকোচন আরও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে প্রোস্টাগ্লান্ডিনের মাত্রা আরও বাড়ে, ফলে মাসিকের দরুন তলপেটে ব্যথাও বাড়ে।

চিত্র. স্ত্রী জননতন্ত্র

সকল মহিলার শরীরেই মাসিকের সময় এই শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াটি ঘটে, তবে ভিন্ন ভিন্ন মহিলার শরীরে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন তৈরির মাত্রা বিভিন্ন হওয়ায় ব্যথারও তারতম্য হয়। দেখা গেছে, যেসব মহিলার প্রাইমারি ডিসমেনোরিয়া থাকে তাদের কন্যাসন্তানের মধ্যেও প্রাইমারি ডিসমেনোরিয়ার উপসর্গ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

সেকেন্ডারি ডিসমেনোরিয়া কী ও কেন?

অন্য যেসব শারীরিক জটিলতার কারণে মাসিকের ব্যথা হয় বা মাসিকের ব্যথা পূর্বের চেয়ে তীব্র হয় তাকে সেকেন্ডারি ডিসমেনোরিয়া বলে।

কারণগুলি হল:

➢ এন্ডোমেট্রিয়েসিস—যখন জরায়ুর দেওয়ালের স্বাভাবিক কোষকলা-স্তর অন্য কোনো স্থানে, যেমন ডিম্বাশয় বা ফ্যালোপিয়ান নালিতে অবস্থান করে তখন মাসিকের সময় পেশি সংকোচনের সময় এই অংশ থেকেও প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন নিঃসৃত হয়, ফলে মাসিকের ব্যথা তীব্র হয়। সেকেন্ডারি ডিসমেনোরিয়ার প্রধান কারণ এই এন্ডোমেট্রিয়োসিস।

➢ ফাইব্রয়েড—এটি জরায়ুর পেশিস্তরে তৈরি হয় এমন টিউমার যা ক্যান্সারের টিউমার নয়। কিন্তু এর জন্যে মাসিকের সময় রক্তস্রাব পরিমাণে বেশি হয় এবং মাসিকও ব্যথাপূর্ণ হয়।

➢ পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ বা PID—যখন জরায়ু, ফ্যালোপিয়ান নালি এবং ডিম্বাশয় ব্যাকটিরিয়া দিয়ে সংক্রামিত হয় এবং তার ফলে ওই স্থানগুলিতে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। তখন ঋতুস্রাবের সময় তলপেট ব্যথা করে।

➢ অনেক সময় গর্ভনিরোধক হিসেবে জরায়ুর মধ্যে 'লুপ' (Intrauterine Device বা IUD) বা তামার তৈরি একটি 'T' আকৃতির তার ঢুকিয়ে রেখে দেওয়া হয়। এটা ব্যবহারের ফলে মাসিকের ব্যথা হতে পারে।

মাসিকের অসহ্য ব্যথা ছাড়াও আর যে যে উপসর্গ ও লক্ষণ থাকলে সেকেন্ডারি ডিসমেনোরিয়া সন্দেহ করবেন তা হল:

☞ মাসিক অনিয়মিত হওয়া।

☞ পরপর দু-বার মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে রক্তস্রাব হওয়া।

☞ ঘন ও দুর্গন্ধযুক্ত যোনিস্রাব দেখা দেওয়া।

☞ যৌনসংসর্গ-এর সময় তলপেটে ব্যথা অনুভূত হওয়া।

যদি এই তিনটির কোনো একটি অবস্থা দেখা দেয় মহিলাদের তাহলে ডাক্তারি পরামর্শের প্রয়োজন।

আরও কিছু কথা:

⌘ মাসিক হলে মাসিকের ব্যথা নাও হতে পারে।

⌘ কারও কোনো এক মাসে মাসিকের ব্যথা হলে অন্য মাসে নাও হতে পারে।

⌘ কারও মাসিক শুরু হওয়ার প্রথম দিকে মাসিকের ব্যথা হয় না, কারও পরের দিকে ব্যথা হতে পারে।

এই সবগুলিই স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় কারণে মাসিকের ব্যথার জন্য হতে পারে। সুতরাং অযথা দুশ্চিন্তা করার কারণ নেই।

যেক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে:

▲ যদি কারও মাসিকের ব্যথা সাধারণত যতটা অনুভূত হয়, তার চেয়ে হঠাৎ বেশি মাত্রায় অনুভূত হতে থাকে।

▲ যদি কারও মাসিক না চলাকালীনও তলপেটে ব্যথা থাকে।

সাধারণত অন্য কোনো জটিলতার কারণে মাসিকের ব্যথা ৩০ থেকে ৪৫ বছর বয়সি মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়।

মাসিক হলে মাসিকের ব্যথা নাও হতে পারে। কারও কোনো এক মাসে মাসিকের ব্যথা হলে অন্য মাসে নাও হতে পারে। কারও মাসিক শুরু হওয়ার প্রথম দিকে মাসিকের ব্যথা হয় না, কিন্তু পরের দিকে ব্যথা হতে পারে। . . . সুতরাং অযথা দুশ্চিন্তা করার কারণ নেই।

কীভাবে মাসিকের ব্যথা থেকে মুক্তি পাবেন?

মাসিকের ব্যথায় ব্যথানাশক খাওয়া যেতে পারে, যেমন প্যারাসিটামল। এটি ব্যথা-উপশমকারী ওষুধগুলির মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ ওষুধ। তবে আইবুপ্রোফেন জাতীয় ওষুধ মাসিকের ব্যথায় ভালো কাজ করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই ধরনের ওষুধ ভরা পেটে খেতে হয়।

কিছু জীবনযাত্রার পরিবর্তন:

⅄ ধূমপান বর্জন করা।

- হালকা ব্যায়াম যেমন সাঁতার কাটা, সাইক্লিং করা।
- হট প্যাড বা উষ্ণ জলের বোতল তলপেটে রাখলে ব্যথার আরাম হয়।
- হালকা হাতে তলপেটের চারিদিকে চক্রাকারে ম্যাসাজ করলে ব্যথার আরাম হয়।
- TENS (Transcutaneous electronic nerve stimulation)—এটি একটি ব্যাটারিচালিত যন্ত্র, যার মাধ্যমে তড়িৎ শক্তি চালনা করে মাসিকের ব্যথা কমানো হয়।

কখন ডাক্তার দেখাবেন? কোন ডাক্তার দেখাবেন?

ব্যথা যদি সাধারণ বেদনানাশক বড়িতেও না কমে তাহলে ডাক্তারি পরামর্শের প্রয়োজন হতে পারে। আবার সেকেন্ডারি ডিসমেনোরিয়ার লক্ষণ মনে হলে ডাক্তার দেখাতে হবে।

> ঋতুচক্রের সময় সামান্য একটু ব্যথা সকলেরই হয়, তবে ডিসমেনোরিয়া আমরা তাকেই বলব যখন এই ব্যথা মেয়েদের দৈনন্দিন কাজকর্মে বাধা দেয় বা ওষুধ খেয়ে ব্যথা কমাতে হয়।

অনেক সময় মাসিকের ব্যথায় চিকিৎসায় হরমোন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সাধারণ চিকিৎসক বা জেনারেল ফিজিশিয়ান প্রয়োজনে গর্ভনিরোধক বড়ি বা OCP বা Contraceptive implant বা injection দিয়ে চিকিৎসা করতে পারেন। যদি ৩ মাস গর্ভ নিরোধক বড়ি ও ব্যথা-উপশমকারী ওষুধ দিয়ে চিকিৎসার পরও মাসিকের ব্যথা কম না হয় তাহলে অবশ্যই স্ত্রীরোগ (গাইনোকোলোজি) বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ গাইনোকোলোজিস্ট দেখাতে হবে।

যে যে পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন হয় মাসিকের ব্যথার কারণ সন্ধানে:

- মূত্র পরীক্ষা ও রক্ত পরীক্ষা।
- পেলভিক আল্ট্রাসোনোগ্রাফি।
- ল্যাপারোস্কোপি।
- হিস্টেরোস্কোপি।

যদি পরীক্ষাগুলির মাধ্যমে প্রথমে উল্লিখিত সেকেন্ডারি ডিসমেনোরিয়ার কোনো একটি কারণ ধরা পড়ে তাহলে প্রথমে সেই সমস্যার চিকিৎসা করতে হয়।

যেমন, PID-এর ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। ফাইব্রয়েড-এর ক্ষেত্রে শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে টিউমারটি কেটে বাদ দেওয়া হয়।

মাসিক ও মাসিকের ব্যথা সংক্রান্ত কিছু ভ্রান্ত ধারণা:

অনেকে মনে করেন যাদের মাসিকের ব্যথা হয় তাদের গর্ভধারণ করার ক্ষমতা অন্য মহিলাদের থেকে কম হয়। প্রাইমারি ডিসমেনোরিয়া যাদের হয় তাদের ক্ষেত্রে গর্ভধারণের সঙ্গে মাসিকের ব্যথার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে যাদের মাসিকের ব্যথার কারণ এন্ডোমেট্রিয়োসিস বা PID তাদের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

> কিছু জীবনযাত্রার পরিবর্তন প্রয়োজন। ধূমপান বর্জন করা। হালকা ব্যায়াম যেমন সাঁতার কাটা, সাইক্লিং করা। হট প্যাড বা উষ্ণ জলের বোতল তলপেটে রাখলে ব্যথার আরাম হয়। হালকা হাতে তলপেটের চারিদিকে চক্রাকারে ম্যাসাজ করলে ব্যথার আরাম হয়।

অনেকে মাসিকের সময় রক্তস্রাবের সাথে নিঃসৃত ছোটো মাংসপিণ্ডের ন্যায় অংশ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। আগেই বলেছি মাসিকের সময় স্বাভাবিকভাবে পেশি সংকোচনের দরুন রক্তজালিকায় চাপ পড়ে কোষে রক্ত সরবরাহ ব্যাহত হয়, এর ফলে কিছু পেশিকোষের মৃত্যু হয় আর সেই মৃত কোষগুলি রক্তস্রাবের সাথে যোনিপথ দিয়ে বের হয়। এই পেশিকোষগুলিকেই মাংসপিণ্ডের মতো দেখায় এবং সেটাকে অস্বাভাবিক কিছু বলে ভাবার কারণ নেই।

তবে যদি মাসিকের সময় মাংসপিণ্ডের বদলে জমাট রক্তপিণ্ড দেখা দেয় তাহলে কখনোই অবহেলা নয়। রক্তপিণ্ড না মাংসপিণ্ড চেনার সহজ উপায় রক্তপিণ্ড হলে তা ভেঙে যাবে চাপ দিলে কিন্তু মাংসপিণ্ড ভাঙবে না।

এতক্ষণে আমরা বুঝে গেছি মাসিকের ব্যথা অসহ্য হতে পারে কিন্তু তা গোলমেলে নাও হতে পারে, কিন্তু মাসিকের ব্যথার সঙ্গে অন্য কোনো উপসর্গ বা লক্ষণ দেখা দিলে তা প্রায়শই গোলমেলে হয়। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অনিন্দিতা দাস, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি একটি হাসপাতালের চিকিৎসক।

বালবিধবা থেকে মহিলা ডাক্তার

ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে

পর্ব চোদ্দো

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

‘ডা. হৈমবতী সেন-এর (১৮৬৬-১৯৩৩) দিনলিপি থেকে’ পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (এপ্রিল-মে, ২০১৬) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সংসার-সমাজ-প্রশাসন-সহ প্রায় এক সার্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে হৈমবতীর একক-সংগ্রামকে অনুধাবন করতে গেলে তাঁর সময়কাল, পরিপার্শ্ব, সমাজ-সংস্কৃতিকেও খুঁটিয়ে জানতে হয়। সে কারণে দিনলিপির অনেক-আপাত-সম্পর্কহীন খুঁটিনাটি বিবরণও যথাসম্ভব এ-লেখায় রেখে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

‘বিচ্ছিন্নতার ধারণাই মিথ্যে। মানুষে আর ঈশ্বরে কোনো ভেদাভেদ নেই।’ ‘তাহলে এত ধর্মাচরণ আর উপাসনার দরকারটাই-বা কী?’ তিনি বললেন: ‘অদ্বৈত সম্পর্কে মানুষ অচেতন। সেজন্যেই আমাদের ঈশ্বরকে এক ভিন্ন সত্তারূপে অর্চনা করতে বলা হয়।’ ‘তাহলে বাবা, এত যে দেবদেবী, সব মিথ্যে?’ তিনি বললেন: ‘কী বলছ তোমরা? ভক্ত যে ভগবানকে পুজো করে, তিনি তো সর্বত্র বিরাজমান। তাঁর মহিমা বিশ্বনিখিল-চরাচর জুড়ে।’ ‘বাবা, আজকে আমাদের বিদায় নিতে হচ্ছে, ভাগ্যে থাকলে ফের আপনাকে প্রণাম জানাতে আসব।’ এই বলে, তাঁর পদধূলি নিয়ে আমরা উঠে দাঁড়ালাম। তিনি আশীর্বাদ করলেন ও বললেন: ‘সদা আনন্দে থাকো।’

ফিরে এসে আমাদের দরজায় দেখি তালা লাগানো। সবাই মিলে শিব মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখতে গেছে। বাড়ির ভেতরে ঢোকার তো কোনো উপায় নেই; তিনজনে মিলেই ঠিক করলাম, ওদের পথেই হাঁটা যাক। আমরা যখন মন্দিরে গিয়ে পৌঁছোলাম, ততক্ষণে সন্ধ্যারতি শুরু হয়ে গেছে। বিশ্বেশ্বর মন্দিরে এক ঘণ্টা ধরে আরতি হয়। দেখলাম, আমাদের বাড়ির সব বউ-ঝি-রা সেখানে হাজির, পুলিনবাবুর পরিবারের সকলেও সেখানে আছে। পুরুত-গিন্নি এসেছেন হরিদাসীর সঙ্গে। হরিদাসী তাঁর সঙ্গেই থাকে। কেউ বলতে পারবে না, হরিদাসীকে নিয়ে কেউ কোনোদিন দুটো ভালো কথা বলেছে। বোন মোক্ষদা তো ওকে দু-চক্ষে দেখতে পারত না। যেহেতু হরিদাসী পুলিনবাবুর খুড়িমার গাঁয়ের মেয়ে সেজন্যে তাঁকেই ওর খাওয়া-পরা জোগাতে হত। তাই মোক্ষদা ভেতর ভেতর জ্বলে পুড়ে মরলেও মুখে কিছু বলার সাহস পেত না। এইভাবেই হরিদাসী নড়াইল-পরিবারের বাসিন্দা হয়ে উঠল, তাঁদের সঙ্গেই মন্দিরে যেত, নিত্য সন্ধ্যারতিতেও তাঁদের সঙ্গ নিত। কিন্তু সেদিন একটা ঘটনা ঘটল। আরতি শেষ হওয়ার পর আমরা যখন মন্দির প্রদক্ষিণ করছিলাম, আমাদের সঙ্গে ছিল দু-জন হিন্দুস্থানি (উত্তর ভারতীয়) লোক। প্রদক্ষিণ চলাকালীন এক জোয়ান ছোকরা তার পিছু নিল এবং তার পাছায় চিমটি কাটতে লাগল। ও মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকিয়ে হি হি করে হাসছিল। আমরা প্রদক্ষিণ বন্ধ করে বারান্দায় বসে পড়লাম। খুড়িমা বললেন: ‘কী হল? থেমে গেলে কেন? আর বসেই-বা পড়লে কেন?’ বললাম: ‘আমি আর হাঁটতে পারছি না।’ আসলে আমি ভয় পাচ্ছিলাম। যে লোকটা ওকে চিমটি কাটছে সে যদি আমাকেও চিমটি কাটে। তাহলে তো অত লোকের মাঝে আমার অপমান-হেনস্থার একশেষ। আমি বসে পড়ার পর ভুবনদিদিও আমার পাশে বসে পড়লেন, সঙ্গে তাঁর স্বামীও।

আরও এক পাক ঘোরা পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। পাক ঘোরা শেষ হলে সকলে যখন ভূমিতে নত হয়ে প্রণাম করছে তখন ওই ছোকরা সব্বাইকে ঠেলেঠুলে হরিদাসীর পেছনে গিয়ে তার ঘাড়ের ওপর পড়ল। আমি ভুবনদিদিকে ঠেলা দিয়ে ব্যাপারটা দেখালাম, তার কর্তাও ব্যাপারটা নজর করলেন। ফের লোকজন পাক দেওয়া শুরু করল, চলতে লাগল চিমটি কাটা। মনে হচ্ছিল, ওরা প্রায় একশো পাক ঘুরে ফেলেছে। একগাদা লোকজন ঘুরছে, প্রতিটি মন্দিরের দরজায় মাথা ঠুকছে আর প্রতিবারই প্রচণ্ড ঠেলাঠেলি আর ধাক্কাধাক্কি চলছে। এক বৃদ্ধা ধাক্কার চোটে পড়েই গেলেন। কোনোমতে নিজেকে সামলেসুমলে উঠে পড়তে পেরেছিলেন। আমরা তিনজনে বসে বসে এইসব দেখছিলাম। ঠাকুরের দোরে মাথা ঠুকতে গিয়ে কেবল ধাক্কা আর চিমটি খাব—অত ভক্তি আমার নেই। পুরুত-গিন্নি এবং সৌদামিনী দেবী আমাদের দেখতে পেয়েছিলেন। সৌদামিনী দেবীর বোন তিনকড়ি এবং কাত্যায়নীও এল। আমরা সবাই মিলে অন্নপূর্ণা মন্দির দর্শন করে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম। ভূতেশ্বর মন্দিরের কাছের গলিতে ঢুকতে-না-ঢুকতেই অনেকগুলো বাঙালি নারীর আর্ত চিৎকার শুনতে পেলাম। ছুটে গেলাম সেখানে। দেখেশুনে আমরা তো থ! দেখলাম ওই হিন্দুস্থানী ছোকরাটা হরিদাসীর এক হাত ধরে টানছে, আর এক হাত ধরে টানতে টানতে বউ-ঝি-রা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। ভুবনদিদির স্বামী জোর গলায় রামতেওয়ারিকে ডাকলেন। রামতেওয়ারি তেলেভাজা বেচে। ও ছুটে এসে এক ধাক্কায় ছোকরাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল: 'মা, তুমি তো একটা গুণ্ডা-বদমাশের পাল্লায় পড়েছ। ওই ছোকরার নাম গোলাপ পাণ্ডে, একটা ডাকসাইটে গুণ্ডা। ওর যখন যা মনে ধরে ও তাই করে ছাড়ে। সঙ্গে লোক না নিয়ে তুমি একা একা কেন এসেছ? চলো, তোমাকে আমি বাড়ি পৌঁছে দিই।' এই কথা বলে ওই তেলেভাজা বিক্রেতা চলল সবার আগে আর খুড়ো সবার পিছনে। আমরা অন্যদের আগেই বাড়ি পৌঁছে গেলাম। মন্দিরে যা দেখেছি সব সৌদামিনী দেবীকে খুলে বললাম। শুনে তিনি বললেন: 'তখন বললে না কেন? আমি পুরুত-গিন্নিকে হুঁশিয়ার করে দিতে পারতাম।' আমরা একটু হেসে বললাম: 'মা, গোরু-বাছুরের মধ্যে যদি ভাব-ভালোবাসা-বোঝাপড়া থাকে তবে সে লুকিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়বে বাছুরকে দুধ খাওয়াতে। হরিদাসী এসব খেলায় অনেকদিন ধরেই দড়। ও কি তোমার হুঁশিয়ারি কানে নেবে? ওর বয়েই গেছে।'

সৌদামিনী দেবী বললেন: 'ঠিকই বলেছিস তুই। তোর সঙ্গে যখন এখানে-ওখানে যাই, কই কখনো তো কোনো ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের মুখোমুখি হইনি। জানি না, এরপর আমাদের কপালে কী লেখা আছে? ক্যাতায়নী, তিনকড়ি আর হেম—এই তিনটে উঠতি-বয়সের মেয়েকে নিয়েই তো আমার ঘোর দুশ্চিন্তা।'

ভুবনদিদি বললেন: 'কিন্তু হেম তো বাড়ি ফিরে যাচ্ছে।' সৌদামিনী দেবী জিগেস করলেন: 'কেন?' ভুবনদিদি জবাব দিলেন: 'ও এখানে এত কষ্টে থাকে। আর এমন কেউ তো নেই যে ওকে একটু সাহায্য করে, পথ দেখায়। তাছাড়া বেনারস (আমি শিব ঠাকুরকে গড় করি)* ওর মতো যুবতী নারীর বসবাস করার পক্ষে মোটেই ভালো জায়গা নয়। বাড়ি ফিরে গেলে ওর সবকিছুই ঠিকঠাক চলতে পারে যদি ওর ভাই ওর সব পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেয়।' আমি বললাম: 'আমি মোটেই ভাইয়ের কাছে ফিরে যাচ্ছি না, আর ভাইয়েরও আমাকে কিছু ফিরিয়ে

'আমি মোটেই ভাইয়ের কাছে ফিরে যাচ্ছি না, আর ভাইয়েরও আমাকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে মোটেই নেই। আমি যাচ্ছি হিন্দু বিধবাদের এক নতুন আশ্রমে। সেখানে থেকে বিধবারা পড়াশোনা করে।

দেওয়ার ইচ্ছে মোটেই নেই। আমি যাচ্ছি হিন্দু বিধবাদের এক নতুন আশ্রমে। সেখানে থেকে বিধবারা পড়াশোনা করে।' 'কী বলছিস তুই? সত্যি নাকি? না, ওখানে কোনোভাবেই তোর যাওয়া হবে না। ভগবান জানে, সেখানে কোন বেজাত-কুজাতের হাতের রান্না খেয়ে তুই জাত হারাবি। না, না অমন বিপদে পড়ার ঝুঁকি নেওয়ার কোনো দরকার নেই।' আমি চুপ করে রইলাম। সৌদামিনী দেবী কী করে নিজের মানমর্যাদা বজায় রাখতে হয়, নানাভাবে তা নিয়ে একগাদা উপদেশ দিলেন। তারপর চুপ করে গেলেন।

কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। পুরুত-গিন্নি এলেন। তখন আমরা যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। খুড়িমা তাঁর বিছানা থেকে আমাকে ডাকলেন: 'তুই আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছিস, আর আমার ভেতরটা যে খাক হয়ে যাচ্ছে। এত কষ্ট আমাকে তুই দিচ্ছিস কেন বল তো? আমি কোনোদিন কাউকে নিজের করে নিইনি, বেশ ছিলাম। জানি না তোকে কেন এত আপন করে নিলাম। আমার মনটা যে ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে। সবসময় উদ্‌বেগ আর দুশ্চিন্তা: কোথায় যাবি? কী করবি? কী খাবি? তোকে নিয়ে আমার মাথা খারাপ।' আমি বললাম: 'ওসব নিয়ে আমি কিছু ভাবি না খুড়িমা। কপালে যা আছে তাই হবে।' আমার কথা শুনে তিনি চুপ করে গেলেন। তিনি খেয়াল করেছিলেন, আমার কথায় উদ্‌বেগের লেশমাত্র ছিল না। কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন: 'কিন্তু আগে ভেবে নিয়ে তারপরে কাজ করা আর আগে কাজ করে তারপরে ভাবতে বসা—এ দুয়ের মধ্যে কিন্তু বিরাট তফাত।' আমি তাঁকে বললাম: 'মা, তুমি আমার কে ছিলে, বলো তো! যাঁর অপার

*বেনারস শিবের পবিত্র বাসস্থান। তাঁর স্থানের বদনাম করাতে তিনি যাতে কোনো দোষ না ধরেন, সেজন্যেই তাঁকে প্রণাম করে নেওয়া।

করুণায় আমি তোমাকে পেয়েছি তিনিই তো আমার দিবারাত্রির সঙ্গী। তিনিই আমাকে ফের তোমার মতো মা, ভুবনদিদির মতো দিদি জুটিয়ে দেবেন। আমি খামোকা বাড়তি দুশ্চিন্তা করতে যাই কেন বলো তো!' বাস্তবিকই সে-সময়ে ভগবানের ওপর আমার পুরোপুরি ভরসা—তাঁর পায়েই জীবন সঁপে দিয়েছিলাম। এখনও যদি তাঁর ওপর আমার সেই একই ভরসা, বিশ্বাস থাকত, তাহলে জীবনটা কত সমুন্নত হয়ে উঠতে পারত! কিন্তু এখনও আমি আমার জেদ ছাড়িনি। পড়াশোনা করার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা এখনও মরে যায়নি। পড়ানোর কাজ করে মোটামুটি খেয়ে-পরে চলে যাচ্ছিল, কাল কী খাব, কোথায় থাকব—এসব ভাবনা

এখনও যদি তাঁর ওপর আমার সেই একই ভরসা, বিশ্বাস থাকত, তাহলে জীবনটা কত সমুন্নত হয়ে উঠতে পারত! কিন্তু এখনও আমি আমার জেদ ছাড়িনি। পড়াশোনা করার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা এখনও মরে যায়নি।

ভাবতে হত না। কিন্তু ওই যে! মাথায় চেপেছে কোন ভূত! সে ভাবনা তো কিছুতেই মন থেকে যাচ্ছে না। কোথায় যাব? কোথায় গেলে একটু লেখাপড়া শিখতে পাব? মাথার ভেতর এই এক চিন্তা ছাড়া আর কোনোকিছুই যেন ঢোকবার পথ পায় না।

আমার ঘরে একটা দড়ির খাটিয়া ছিল। দিনের বেলায় আমি ওটায় বসতাম, কখনো শুয়েও পড়তাম। ওটার একটা পায়া ভাঙা ছিল। রাস্তার পাশে কিছু ছোটো ছোটো মাটির শিবমূর্তি গড়াগড়ি যেত। আমি তার কয়েকটা কুড়িয়ে এনে ভাঙা পায়াটা জোড়া দিলাম। সৌদামিনী দেবী এসব টের পাননি, কেননা বিছানাটা একটা সুজনি দিয়ে ঢাকা থাকত। যখন আমি চলেই যাব, তিনি ঠিক করলেন বিছানাসুদ্ধু খাটিয়াটা বেচে দেবেন। আমি বললাম: 'তুমি কাকে এই ভাঙা খাটিয়াটা বেচবে?' তিনি বললেন: 'কেন? ভাঙা বলছ কেন? খাটিয়াটা তো আস্তই আছে।' এই বলে তিনি বিছানা থেকে সুজনিটা তুলে দিলেন। দেখলেন খাটিয়াটা ভর করে আছে শিবের মাথার ওপর। তিনি যেন সামনে সাপ দেখছেন, এইভাবে এক লাফ দিয়ে উঠলেন। বললেন: 'হতভাগী, করেছিস কী তুই?' আমার খেয়ালই ছিল না, বিছানাটা শিবের মাথার ওপরই আছে। চরম আঘাতে তিনি কেমন বিবশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে বসে রইলেন। তারপর রাগে গনগন করতে করতে আমার দিকে কড়া চোখে চেয়ে রইলেন। আমি জিগেস করলাম: 'আমি কী করলাম, খুড়িমা?' তিনি জবাব দিলেন: 'কী করেছ? আমার পিণ্ডি* দেওয়ার সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছ। এই আর কী! এইজন্যেই শিবঠাকুর তোকে এখানে আর এক মুহূর্তও থাকতে দিতে চান না। শিবের মাথার ওপর বিছানা করে তুই শুয়ে থাকতি? কী করে এই পূণ্যভূমিকে তুই এভাবে কলুষিত করে তুলতে পারলি?' আমি হেসে উঠে বললাম: 'তোমার কথা শেষ হয়েছে? এবার আমার একটা কথা শোনো। শিবলোকে যাওয়ার জন্যেই তো তোমার এত পুজোআচ্চার ঘটা! আর আমি স্বয়ং শিবের মাথার ওপর আমার আসন পেতেছি। তিনিই আমাকে শিবলোকে বয়ে নিয়ে যাবেন। তুমি দেখো খুড়িমা, আমি কৈলাসে (শিবলোক) গিয়েই মরব।' তিনি বাঘিনীর মতো আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন ভস্ম করে দেবেন। বললেন: 'এক্ষুনি এখান থেকে দূর হয়ে যা হতভাগী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কী কুৎসিত জঘন্য কথাবার্তা! তোর ওই খেরেস্তানি ধারার কথা কানে শোনাও পাপ। আর টুঁ শব্দটি করবি না তুই কোনোদিন। তুই এতবড়ো বেহায়া, এত তোর ঔদ্ধত্য, যে আমার সামনে তুই ঠাকুরকে অপমান করিস!' দিশেহারার মতো তিনি আমাকে বকাঝকা করেই চলেছেন। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি একজন ধর্মপ্রাণ নারী। আমি শিবের মাটির মূর্তির ওপর বিছানা পেতেছি বলে তিনি চরম আঘাত পেয়েছেন। আমি তক্ষুনি ভুবনদিদির কর্তাকে ডেকে পাঠালাম। তিনি এসে জিগেস করলেন: 'কী হয়েছে, গিরিদিদি?' বাড়ির মালকিন জবাব দিলেন: 'দ্যাখো এসে, হতভাগীটা কী একখানা কাণ্ড করেছে!' বলে তিনি শিবমূর্তির দিকে আঙুল তুলে দেখালেন। তিনি বললেন: 'আরে, তাতে হয়েছেটা কী? ওগুলো তো ফেলে দেওয়া শিবমূর্তি, রাস্তার ধারে মাটিতে গড়াগড়ি খায়। শেয়াল কুকুরে ওর ওপর হাগে। আর এইজন্যে ওকে তুমি এত বকাঝকা করছ? আরে, ও তো অন্তত ওগুলোকে ঘরে নিয়ে এসে একটা উপযুক্ত শোভন জায়গায় রেখেছে।' শেষমেশ তাঁর রাগ কিছুটা পড়ল। বললেন: 'অমরনাথ, এইসব কাজকম্ম তো আমাদের কাছে পাপ। রাগ হয় না, বলো? আর শোনো অমর, আমার তো মনে হয় মেয়েটা কেমন সৃষ্টিছাড়া বাউন্ডুলে। লোকে এসে আমাকে বলে, লোকজন যেসব শিবকে পুজো করে ঘাটের কাছে ফেলে দেয়, ও নাকি সেইসব ফেলে-দেওয়া প্রসাদী ফলমূল শিব সব খেয়ে ফেলে। একবারটি তাকিয়ে দ্যাখো ওর দিকে। চুলে তেল দেয় না, ভাত খায় না, সবজি খায় না। ও কেমনধারা জীব, বলো দেখি!' এসব শুনেটুনে পিসেমশাই উঠলেন হেসে, বললেন: 'তুমি জানো না গিরিদিদি? ও তো যোগিনী হয়ে গেছে।' আমি বেশ বুঝতে পারলাম, খুব সহজে এসবের থেকে আমার নিষ্কৃতি মিলবে না। বললাম: 'শুনুন দিদি, আপনার ঠাকুর যেখানে ছিলেন সেখানেই রেখে আসছি। দেখি, সেখানে আপনার ঠাকুর কেমন আচার-ব্যাভার পায়!' তিনি হাঁ হাঁ করে উঠলেন: 'না, না, তার কোনো দরকার নেই। তিনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন।'

*কেউ কোনো জঘন্য বা ফালতু কাজ করলে, তাকে ধমক দেওয়ার জন্যে এইরকম কথা বলার চল আছে।

হাসি পেলেও বললাম: 'আমার ঘাট হয়েছে, এবারের মতো ক্ষমা করে দাও।' এতক্ষণে তিনি ঠান্ডা হলেন। হেসে উঠে বললেন: 'দ্যাখ তো, অকারণেই তোকে এত ধমকধামক দিলাম, এখন আমার খারাপ লাগছে।' আমি বললাম: 'মন খারাপ করবেন না তো। আমি কিচ্ছুটি মনে করিনি।' 'বাঃ! খুব ভালো। আসলে তুই এমন একটা চমৎকার মেয়ে, আর তোকে আমরা সবাই এত ভালোবাসি!' তখন তাঁকে বুঝিয়ে বললাম, আমি কেন মাটির শিব খেতাম, চুলে তেল দিতাম না। খাওয়া-পরার উপকরণ যদি না জোটে তো আমি কী করব? আমার তো

আমার তো একটাই জেদ, একটাই লক্ষ্য—পড়াশোনা করব আর লোকের সমীহ জাগানোর মতো কাজ করব। লোকে আমায় খেরেস্তান বলল, নাকি অন্যকিছু বলল—সেসবে আমার কিছু যায় আসে না।

একটাই জেদ, একটাই লক্ষ্য—পড়াশোনা করব আর লোকের সমীহ জাগানোর মতো কাজ করব। লোকে আমায় খেরেস্তান বলল, নাকি অন্যকিছু বলল—সেসবে আমার কিছু যায় আসে না।

আমাদের মধ্যে যখন এইসব কথা চলছিল তখন একজন লোক তারাপ্রসন্নর চিঠি নিয়ে এলেন। পিসেমশাই চিঠিটা খুলে জোরে জোরে পড়তে লাগলেন: 'প্রিয় বোন, তুমি যদি মনস্থির করে থাকো, কলকাতায় যাবে, তাহলে আজই এই লোকটির সঙ্গে রাজঘাটে চলে এসো। সেখানে একটা পাশ পাবে। আমার ভাগনে কালীচরণ বাড়ি ফিরছে। আমি ওর সঙ্গেই তোমাকে কলকাতায় পাঠাচ্ছি।' শুনেই আমি আমার ক্যানভাসের ব্যাগ গুছিয়ে নিলাম। সঙ্গে নিলাম একটা কাঁসার থালা, একটা শালের নামাবলি, দুটো শাড়ি, কিছু বইপত্র, পুরুত-গিন্নির কাছে যে বালা-জোড়া রেখেছিলাম সে-দুটো আর মেজদির গচ্ছিত রাখা একশো টাকা। আমি সবার পা ছুঁইয়ে প্রণাম করে মালকিনকে ঘরের চাবি দিয়ে, সকলকে বিদায় জানিয়ে খুড়িমার সঙ্গে তারাপ্রসন্নর বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। আমার কয়েকটা চূড় আর কানের দুলও ছিল। কিন্তু সেগুলো তখনও বাঁধা দেওয়া, ছাড়াতে পারিনি।

তারাপ্রসন্নর বাড়ি পৌঁছে শুনলাম, ট্রেন ছাড়বে বেলা তিনটেয়। ততক্ষণে দুপুর একটা বেজে গেছে। তারাপ্রসন্নর বউ যখন শুনলেন, আমার, খুড়িমার কারোরই খাওয়া হয়নি। তিনি উনুন জ্বালিয়ে চালে-ডালে চাপিয়ে দিলেন। খিচুড়িটা বেশ খেলাম। এবার ছেড়ে যাওয়ার পালা। স্টেশনে গিয়ে একটা কামরায় চেপে বসলাম। আমার জ্ঞাতি-দাদা একটা থার্ড-ক্লাসের পাশ দিয়েছিলেন। তাঁর ভাগনে কালীচরণও যাচ্ছে, তবে সে চড়েছে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে। বহু লোক কামরায় ঢুকছে বেরোচ্ছে। আমি চুপ করে বসেছিলাম আর ভাবছিলাম—কে জানে, আমি কোথায় যাচ্ছি আর এই অনিশ্চিত যাত্রার ভবিষ্যৎই-বা কী? এখানে অন্তত কিছু মানুষজন তো ছিলেন, যাঁরা একদিক থেকে আমার আপনজনই। কিন্তু এখন আর আমার নিজের বলতে কেউ রইল না। কে জানে কপালে কী লেখা আছে? শেষমেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? কেই-বা আমায় মাথা গোঁজার ঠাঁই দেবে? এ সবকিছুরই তো কোনো ঠিকঠিকানা নেই। এমন একটা অনিশ্চিত এলোমেলো যাত্রার পথে আমি কেনই-বা পা বাড়ালাম। কেউ যেন আমাকে অনবরত টেনে টেনে নিয়েই চলেছে; জানি না কোথায়। এ কী ঘোর রহস্য আমার জীবনে? এইসব উদ্‌বেগ দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে গোটা রাতটা কেটে গেল।

সকাল দশটায় মোকামা-য় পৌঁছোলাম। ওখান থেকে ট্রেন বদল করতে হবে। সবাই ট্রেন থেকে নেমে গেল, আমিও। নেমেই একছুটে কালীচরণের কামরার দিকে। সে আমাকে বলল: 'তুমি এখানে বসে থাকো। আমি এক বন্ধুর বাড়ি যাব, চান করব, খাব, তারপর ফিরে আসব। ট্রেন ছাড়বে ছ-টায়। আমি তার অনেক আগেই ফিরে আসব।

'তুমি এখানে বসে থাকো। আমি এক বন্ধুর বাড়ি যাব, চান করব, খাব, তারপর ফিরে আসব। ট্রেন ছাড়বে ছ-টায়। আমি তার অনেক আগেই ফিরে আসব। তখন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে নেব।

তখন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে নেব। আমার যে খুব হিসি পেয়েছে, কোথায় যাব—সেকথা ওকে লজ্জায় বলতে পারিনি। কিন্তু বেগ যখন আর ধরে রাখতে পারছিলাম না, ভাবলাম স্টেশনের বাইরেই যাই। গেটে এক ইউরোপীয় ছোকরা দাঁড়িয়ে। গেট পেরোতে গেলে সে আমার কাছে টিকিট চাইল। আমি আমার পাশটা দিয়ে দিলাম। কিন্তু সে আমাকে পাশটা ফেরত দিল না। বলল: 'তুমি বাইরে থেকে ফিরে এসো, তখন ফেরত পাবে।' তখন কী আর জানতাম, ও আমাকে পাশটা আর ফেরত দেবে না।

আমি একটা ডোবা মতন পুকুর ধারে গেলাম। হিসি করলাম, মাথায় খানিক জলের ছিটে দিয়ে ফিরে এলাম। কিন্তু ইউরোপীয় লোকটিকে কোথাও দেখতে পেলাম না। লোকটা কোথায় দেখার জন্যে চারদিকে নজর ঘোরাচ্ছি; এমন সময় দেখতে পেলাম, লোকটা একটা দরজা খুলছে। অনুনয় করে ওকে বললাম: 'আমার পাশটা ফেরত দিন।' ও বলল: 'এই ঘরে বসে অপেক্ষা করো। তোমার পাশ ফেরত পাবে। তার আগে তোমার মালপত্র এখানে নিয়ে এসো। তুমি যেখানে বসেছিলে,

ওটা তোমার অপেক্ষা করার জায়গা নয়।' সে-সময়ে আমি একেবারে আলাদা রকমের একটা মানুষ ছিলাম। যে যা বলত তাই বিশ্বাস করে নিতাম। আমার ব্যাগপত্তর নিয়ে ওই ঘরে এসে বসলাম। দেখলাম ঘর ভর্তি নানা আসবাবপত্তর—বেশ কিছু কাঠের বাক্স, ওইরকমই আরও কিছু জিনিসপত্তর। আমি ঘরে বসে আছি, এমন সময় দেখি একজন রেল-কর্মচারী ঘরটায় বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল। 'ঘর খোলো, ঘর খোলো' বলে আমি তারস্বরে চেঁচাতে লাগলাম। কিন্তু কেউ কোনো সাড়া দিল না।

কী ভয়ানক ফ্যাসাদে যে আমি পড়েছি, তা তো বেশ টের পাচ্ছি। কিন্তু এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় কী? আমি আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পরিত্রাহি চেঁচামেচি জুড়ে দিলাম; কিন্তু তা কারও কানে গেলে তবে তো। চারপাশে তাকাচ্ছি—কোথাও কোনো বেরোনোর পথ আছে কিনা—নেই, ওই দরজাটা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। কেবল ওপরে সূর্যের আলো আসার জন্যে একটা ঘুলঘুলি মতো জানলা আছে। ঠিক করলাম, ওই জানলা ভেঙেই বেরোতে হবে। এই ঘরে বসে থাকলে কী বিপদে যে পড়ব কে জানে? গায়ে আমার খুব জোর ছিল। আমি কাঠের বাক্স হিড়হিড় করে টেনে জানলার কাছে নিয়ে এলাম। বড়ো বাক্সটার ওপর একটা ছোটো বাক্স চাপালাম। তার ওপরে চড়ে বসলাম। এরপর কাঁসার থালাটা দিয়ে কাচে জোরে একটা ঘা দিলাম। ঝনঝন করে কাচ ভেঙে পড়ল। উঁকি মেরে দেখলাম, কয়েকটা কুঁড়েঘর। যা হবার হবে—দিলাম এক লাফ নীচের দিকে। কয়েকটা বউ-ঝি 'চোর, চোর' বলে চেঁচিয়ে উঠল। এবার সত্যিসত্যিই বিপদে পড়লাম। আমি ধীর পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম: 'দেখুন, আমি চোর নই। খুবই বিপদে পড়েছি, তাই ওই জানলা দিয়ে লাফিয়ে নামতে বাধ্য হয়েছি।' ওরা কিন্তু সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়। আমাকে নিয়ে একটা হুজ্জত পাকানোর তালে ছিল। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ সেখানে এলেন। আমি তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে সব কথা খুলে বললাম। শুনে তিনি বললেন: 'ও তোমাকে টিকিট ফেরত দেয়নি? ওই ট্যাঁশ ফিরিঙ্গিটা একটা হতচ্ছাড়া, বজ্জাতের ধাড়ি—ওটাকে আমি হাড়েহাড়ে চিনি। কিন্তু বাছা, তোমার পায়ের এমন দশা কেন?' আমি চোখ নামিয়ে দেখি, পা দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। খেয়ালই করিনি, কখন ভাঙা কাচে আমার পা কেটে গেছে। এখন তো ওই কাটা-ঘা থেকে রক্ত বেরোনো বন্ধ হচ্ছে না। খুব ভয় পেয়ে গেলাম। এক ব্রাহ্মণী জল আর এক ফালি কাপড় এনে পা ধুয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন। এরপর ব্রাহ্মণ আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি বাপ-ঠাকুরদার নাম বলতেই তিনি কেমন চমকে উঠলেন। বললেন: 'বাছা, আমার আদিবাস আজগড়-এ। তুমি আমাদের জমিদার পরিবারের মেয়ে। কিন্তু তোমার সঙ্গীসাথি কেউ নেই কেন?' বললাম: 'একজন আছেন। তিনি তাঁর বন্ধুর বাড়িতে গেছেন চান-খাওয়া সারতে।'

আমি বাপ-ঠাকুরদার নাম বলতেই তিনি কেমন চমকে উঠলেন। বললেন: 'বাছা, আমার আদিবাস আজগড়-এ। তুমি আমাদের জমিদার পরিবারের মেয়ে।

খুলনা জেলা থেকে আসা ব্রাহ্মণটি এই রেল-স্টেশনে একটা হোটেল চালান। ব্রাহ্মণীর নাম রাধা, তাঁর বোন। ব্রাহ্মণ বললেন: 'রাধা, শিগগিরই ওকে কিছু খেতে দে। এক্ষুনি ট্রেন এসে পড়বে। রেলের বড়োকর্তার কাছে যাই, দেখি, ওর পাশটা ফেরত পাওয়া যায় কিনা।' ব্রাহ্মণী আমার খুব যত্নআত্তি করে দুধ-চিঁড়ে খেতে দিলেন। খিদেও পেয়েছিল খুব, খেয়ে নিলাম সবটা, তারপর ঢকঢক করে এক ঘটি জল খেয়ে নিলাম। ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল। ব্রাহ্মণ ফিরে এসে জানালেন: 'বাছা, তোমাকে একবার বড়োকর্তার কাছে যেতে হবে।' আমি কেমন হতভম্ব হয়ে পড়লাম। তিনি বললেন: 'ঘাবড়ানোর কিছু নেই, আমি তো তোমার সঙ্গে থাকব।'

তাঁর সঙ্গে আমি বড়োকর্তার অফিসে গেলাম। দেখলাম, মোটাসোটা, দুধ-সাদা গায়ের বরণ এক বিলিতি সায়েবকে। তিনি আমায় হিন্দিতে জিগেস করলেন: 'কোথা থেকে আসছ, তুমি?' আমি বললাম, রাজঘাটের স্টেশন মাস্টার আমার জ্ঞাতি। তিনি ঘণ্টি বাজালেন। সঙ্গে সঙ্গে এক আরদালি এসে তাঁর সামনে খাড়া। তিনি এক-টুকরো কাগজে কিছু একটা লিখে আরদালিকে দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই ইউরোপীয় লোকটা, যে আমার টিকিট নিয়ে নিয়েছিল, এসে হাজির। আমাকে দেখা মাত্র তার মুখটা কেমন ফ্যাকাশে মেরে গেল। বড়োকর্তা তার কাছে টিকিট চাইতে সে পকেট থেকে বার করে দিয়ে দিল, কিন্তু পাশটা ফেরত দিল না। বড়োকর্তা রাগ-বিরক্তিতে উঠে দাঁড়িয়ে ওকে 'শাপশাপান্ত' করতে করতে ওর ভেতর-কোটের পকেটে হাত চালিয়ে পাশটা বের করে আনলেন। লোকটাকে তখন কী বলছিলেন তিনি, তা আমি জানি না। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: 'এইটা কি তোমার পাশ?' জবাব দিলাম: 'হ্যাঁ।' তিনি পাশটা আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন, একটু বসতে বললেন। এরপর তিনি আমাকে দুটো দশ টাকার নোট দিলেন। আমি তো কিছুতেই নেব না। তখন তিনি বললেন: 'ও তোমাকে এইভাবে ঝামেলায় ফেলেছে সেজন্যে ওকে আমি জরিমানা করেছি।' এটা শোনার পরে আমি টাকাটা নিয়ে নিলাম। (চলবে)

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক প্রাবন্ধিক ও অভিধানকার।

বিসিজি টিকায় যক্ষ্মা হওয়া আটকায় না, তবু এ টিকা লাগাব কেন?

হাসপাতালে জন্মালে জন্মের পরেই যে টিকা লাগানো হয়, তা হল বিসিজি টিকা। বিসিজি টিকা নিয়ে NHS-এর প্রচারপত্র আমাদের কাজে লাগবে না, কেননা সেখানে যক্ষ্মার টিকা দেওয়া হয় যাঁদের যক্ষ্মা হওয়ার ঝুঁকি বেশি তাঁদের, আমাদের দেশের মতো সমস্ত শিশুদের নয়। লিখেছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**।

বিসিজি—'বি'-তে ব্যাসিলাস অর্থাৎ দণ্ডাকৃতি ব্যাকটিরিয়া, 'সি'-তে কামেট (Calmette) আর 'জি'-তে গুয়েরিন (Guerin)। কামেট আর গুয়েরিন দুই ফরাসি বিজ্ঞানী। যক্ষ্মার জীবাণু মাইকোব্যাকটিরিয়াম টিউবারকুলোসিস আবিষ্কার করেন রবার্ট কখ। তারপর থেকেই চেষ্টা শুরু হয় মৃত বা কমজোর যক্ষ্মার ব্যাকটিরিয়া ব্যবহার করে যক্ষ্মার টিকা তৈরি করার। গোরুর শরীরে যক্ষ্মা উৎপন্ন করে মাইকোব্যাকটিরিয়াম বোভিস। কামেট আর গুয়েরিন ১৯০৬ সালে মাইকোব্যাকটিরিয়াম বোভিসের এক বংশকে কমজোর করার প্রয়াস শুরু করেন, ১৩ বছরে ২৩০ বার চাষ (subculture) করার পর এক ধারাকে পাওয়া গেল, মানুষের শরীরে যা রোগ সৃষ্টি করে না, কিন্তু যক্ষ্মার জীবাণুর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি করার ক্ষমতা যার আছে। এই ধারা পরিচিত হল ব্যাসিলাস কামেট গুয়েরিন নামে। প্রথমে, ১৯২১ থেকে ১৯২৫, বিসিজি মুখে খাওয়ানো হত যেমন করে আজও পোলিও-র টিকা ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন খাওয়ানো হয়। মানুষের শরীরে চামড়ার মধ্যে বিসিজি টিকা লাগানো শুরু হয় ১৯২৭-এ। আর ১৯৪৮-এ বিসিজি নিরাপদ যক্ষ্মা প্রতিরোধক টিকা হিসেবে সারা পৃথিবীতে স্বীকৃতি পেল।

বিসিজি কেন লাগানো হয়?

বিসিজি টিকা লাগানোর উদ্দেশ্য হল শরীরে হালকা ধরনের এক কৃত্রিম যক্ষ্মা জীবাণুসংক্রমণ ঘটানো, তাতে রোগ হবে না, কিন্তু যক্ষ্মার জীবাণুর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে, প্রতিরোধক্ষমতা অর্জিত হবে ভবিষ্যতে যক্ষ্মা সংক্রমণ হলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য।

টিকার রূপ আর সংরক্ষণ

বিসিজি টিকা বর্তমানে ঠান্ডায় শুকনো (freeze-dried) রূপে পাওয়া যায়। গরমের দেশেও ambient তাপমাত্রায় টিকা ঠিক থাকে বেশ কয়েক সপ্তাহ। আলো থেকে দূরে রেফ্রিজারেটরে ১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কম তাপমাত্রায় রাখলে এক বছর এই টিকা কার্যকর থাকে। নর্মাল স্যালাইন (NaCl) অর্থাৎ সাধারণ লবণের ০.৯% দ্রবণে গুলে এই টিকা লাগানো হয়। এভাবে তৈরি করার পর টিকা ব্যবহার করতে হয় ৩ ঘণ্টার মধ্যে, তারপর যেটুকু পড়ে থাকে ফেলে দিতে হয়।

টিকার মাত্রা

০.১ মিলিলিটারে ০.১ মিলিগ্রাম হচ্ছে টিকার সাধারণ মাত্রা। ৪ সপ্তাহের কমবয়সি নবজাতকদের লাগানো হয় ০.০৫ মিলিলিটার।

কীভাবে লাগানো হয়?

টিকা লাগানো হয় চামড়ার মধ্যে (intradermal) ইঞ্জেকশন দিয়ে, টিউবারকুলিন সিরিঞ্জ নামক এক বিশেষ সিরিঞ্জের সরু সুচ দিয়ে, বাহুতে যেখানে ডেল্টয়েড পেশি এসে লেগেছে ঠিক তার ওপরে। চামড়ার মধ্যে ইঞ্জেকশন না লেগে যদি চামড়ার নীচে লাগে তাহলে ফোঁড়া হতে পারে। বাহুর বেশি ওপরে, আগে বা পেছনে ইঞ্জেকশন লাগালে কাছাকাছি গ্ল্যান্ড ফুলে ব্যথা হতে পারে। ঠিকমতো টিকা লাগলে চামড়ায় ৫ মিলিমিটার ব্যাসের চাকার মতো ফুলে ওঠে।

টিকা লাগানোর সময় কোনো সাবানজাতীয় জিনিস বা জীবাণুনাশক যেন টিকার সংস্পর্শে না আসে। স্পিরিট দিয়ে জায়গাটা মোছা হলে ইঞ্জেকশন লাগানোর আগে যেন স্পিরিট শুকিয়ে নেওয়া হয়।

কোন বয়সে? কাদের?

কোন বয়সে বিসিজি টিকা লাগানো হবে তা নিয়ে একেক দেশের নীতি একেক রকম। ভারতের মতো যেসব দেশে যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব খুব বেশি এবং ছোটোদের যক্ষ্মা হওয়ার ঝুঁকি বেশি, সেখানে নবজাতকদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিসিজি টিকা দেওয়া হয়—হাসপাতালে শিশু জন্মালে জন্মের পরেই না হলে ৬ সপ্তাহে ডিপিটি ও ওরাল পোলিও ভ্যাকসিনের সঙ্গে। দেখা গেছে জীবনের প্রথমেই এই টিকা লাগালে তা উচ্চ স্তরের সুরক্ষা দেয়, বিশেষত শিশুদের খারাপ ধরনের যক্ষ্মা ও যক্ষ্মাজনিত মেনিঞ্জাইটিস হওয়া আটকায়।

যেসব দেশে যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব কম, সেখানে যাঁদের ঝুঁকি বেশি কেবল তাঁদের বিসিজি লাগানো হয়, যেমন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের। এছাড়া যক্ষ্মারোগীদের সংস্পর্শে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা মান্টু-নেগেটিভ তাঁদেরও বিসিজি টিকা দেওয়া হয়।

ভারতের বর্ধিত টিকাকরণ কর্মসূচিতে বিসিজি-র বুস্টার ডোজ নেই। কিন্তু কিছু দেশে জন্মের সময় বিসিজি লাগানো হোক বা নাই হোক, স্কুল যাওয়ার বয়সে বিসিজি লাগানো হয়, যাতে প্রাপ্তবয়স্কদের ধরনের যক্ষ্মা প্রতিরোধ করা যায়।

টিকা লাগানোর পর কী কী হওয়া উচিত ?

ঠিকঠাক বিসিজি টিকা লাগানোর দুই-তিন সপ্তাহ পর টিকা লাগানোর জায়গায় একটা ফুসকুড়ি (papule) দেখা দেয়। সাইজে তা বাড়তে থাকে, প্রায় ৫ সপ্তাহে তার সাইজ দাঁড়ায় ৪ থেকে ৮ মিলিমিটার ব্যাসের। তারপর হয় তা শুকিয়ে যায় অথবা ফেটে গিয়ে অগভীর এক ঘা তৈরি হয়, খোসায় ঢাকা। ৬ থেকে ১২ সপ্তাহের মধ্যে সব শুকিয়ে গিয়ে ৪ থেকে ৮ মিলিমিটার ব্যাসের এক ছোটো স্থায়ী অগভীর ক্ষতচিহ্ন থেকে যায়। আমাদের বেশির ভাগের বাম বাহুতে যে ক্ষতচিহ্ন, তা বিসিজি-র ক্ষতচিহ্ন। ৮ থেকে ১৪ সপ্তাহের মধ্যে ব্যক্তির শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে যায়, যার প্রমাণ মান্টু-পজিটিভ হওয়ায় পাওয়া যায়।

বিসিজি-র জটিলতা

- টিকার জায়গায় বড়ো ঘা দীর্ঘ দিন থেকে যাওয়া।
- গ্ল্যান্ড পেকে পুঁজ হওয়া।
- হাড়ের জীবাণু সংক্রমণ বা osteomyelitis।
- বিসিজি দ্বারা ছড়িয়ে পড়া সংক্রমণ, যার পরিণতি হতে পারে মৃত্যু।

বড়ো ঘা এবং গ্ল্যান্ড পাকা হয় যাদের টিকা লাগানো হল, তাদের ১ থেকে ১০%-এর। আর বিসিজি থেকে শরীরে ছড়িয়ে পড়া সংক্রমণ হয় ১০ লক্ষ জনের মধ্যে ১-এরও কম জনের, যাদের শরীরে কোষঘটিত প্রতিরোধ ক্ষমতা অস্বাভাবিক রকম কম।

পেকে ফোঁড়া হলে প্রয়োজনে সুচ দিয়ে পুঁজ টেনে বার করা যায়। তাতে না হলে কেটে পুঁজ বার করে কাটা ঘায় রোজ প্যারা অ্যামাইনো স্যালিসিলিক অ্যাসিড (PAS) বা আইসোনিয়াজাইড (INH) পাউডার লাগানো হয়। মুখে বা ইঞ্জেকশন দিয়ে যক্ষ্মার ওষুধ দেওয়ার দরকার পড়ে না। এই জটিলতা এড়াতে বিসিজি টিকা কেবল চামড়ার মধ্যে লাগানো উচিত এবং যে বাহুতে বিসিজি টিকা লাগানো হয়েছে তাতে পরবর্তী ৬ মাস অন্য টিকা লাগানো উচিত নয়।

বিসিজি কত দিন সুরক্ষা দেয়?

টিকা লাগানোর পর সুরক্ষার মেয়াদ মোটামুটি ১৫ থেকে ২০ বছর। অন্য কিছু টিকার মতো বিসিজি-র বুস্টার ডোজ লাগে কিনা জানা নেই। ভারতের বর্ধিত টিকাকরণ কর্মসূচিতে বিসিজি-র বুস্টার ডোজ নেই। কিন্তু কিছু দেশে জন্মের সময় বিসিজি লাগানো হোক বা নাই হোক, স্কুল যাওয়ার বয়সে বিসিজি লাগানো হয়, যাতে প্রাপ্তবয়স্কদের ধরনের যক্ষ্মা প্রতিরোধ করা যায়।

জটিলতা এড়াতে বিসিজি টিকা কেবল চামড়ার মধ্যে লাগানো উচিত এবং যে বাহুতে বিসিজি টিকা লাগানো হয়েছে তাতে পরবর্তী ৬ মাস অন্য টিকা লাগানো উচিত নয়।

কাদের বিসিজি লাগানো যাবে না?

- যাদের সারা শরীরে একজিমা আছে।
- যাদের চামড়ায় জীবাণুসংক্রমণ আছে।
- রক্তে যাদের গামাগ্লোবিউলিন নামক প্রোটিনের মাত্রা কম।
- যাদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কম।

শেষ কথা

যদিও বিসিজি যক্ষ্মার বিরুদ্ধে কতটা সুরক্ষা দেয়, তা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণার ফল বিভিন্ন, তবু কোনো দেশের জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচির এক মৌলিক উপাদান হল বিসিজি টিকা। এটা প্রমাণিত খারাপ ধরনের শিশুদের যক্ষ্মা—মিলিয়ারী যক্ষ্মা ও যক্ষ্মাজনিত মেনিঞ্জাইটিস ঠেকাতে বিসিজি টিকা কার্যকরী। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

সূত্র: Park's Textbook of Preventive and Social Medicine।

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক।

হরেকরকম

বাচ্চাদের দাঁত ওঠার সময়

দাঁত ওঠার সময় বাচ্চারা যেন বদলে যায়। অল্প কিছু বাচ্চা জন্মায় দাঁত নিয়ে। কিছুজনের প্রথম দাঁত বেরোয় ৪ মাস বয়সের আগে, কিছুর দাঁত বেরোতে আবার ১২ মাস লেগে যায়। তবে বেশির ভাগের দাঁত ওঠে ৬ মাসের আশে-পাশে।

দাঁত ওঠার সময়

কখনো কখনো দাঁত ওঠার সময় ব্যথা বা কোনো অস্বস্তি হয় না। কিন্তু অনেকের আবার—

মাড়ীর যেখান দিয়ে দাঁত বেরোচ্ছে, সেই জায়গাটা লাল ও ব্যথা হয়ে থাকে।

- একদিকের গালটা লাল হয়ে থাকে।
- মুখ দিয়ে বেশি লালা গড়ায়।
- কাছে যা পায় কামড়াতে ও চিবোতে থাকে।
- স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি অস্থির হয়ে থাকে।

অনেকে ভাবেন দাঁত ওঠার জন্য পাতলা পায়খানা ও জ্বর হয়। কিন্তু আসলে তেমনটা নয়।

কোন সময়ে কোন দাঁত?

☞ নীচের পাটির মাঝের কৃন্তক (lower central incisors) অর্থাৎ সামনের দাঁত সাধারণত প্রথমে ওঠে, সাধারণত ৫ থেকে ৭ মাস বয়সে।

☞ ওপরের পাটির মাঝের কৃন্তক (upper central incisors) অর্থাৎ সামনের দাঁত—৬ থেকে ৮ মাসে।

☞ ওপরের পাটির পাশের কৃন্তক (upper lateral incisors) অর্থাৎ সামনের দাঁত দু-টির দু-পাশে—৯ থেকে ১১ মাসে।

☞ নীচের পাটির পাশের কৃন্তক (lower lateral incisors) অর্থাৎ সামনের দাঁত দু-টির দু-পাশে—১০ থেকে ১২ মাসে।

☞ প্রথম পেষক দাঁত (first molar)—১২ থেকে ১৬ মাসে।

☞ শ্বদন্ত (canine) বা কুকুরে দাঁত—১৬ থেকে ২০ মাসে।

☞ দ্বিতীয় পেষক দাঁত (second molar)—২০ থেকে ৩০ মাসে।

বেশির ভাগ বাচ্চারই মোটামুটি আড়াই বছর বয়সের মধ্যে সব ক-টি দুধের দাঁত (মোট কুড়িটি) বেরিয়ে আসে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

Advt.

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র

৩১, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬

যোগাযোগ ঃ ৯৮৩৬৪৭৭১৯৫, ৯৮৩০৬৭৩৫১২

এছাড়া কমবয়সীদের জন্য আছে আকর্ষণীয় গল্প-ফিচার-ছবিতে ঠাসা কিশোর যুক্তিবাদী

হরেকরকম

প্যাসিভ স্মোকিং কী? তা কি ক্ষতিকারক?

অন্য লোক সিগারেট খাচ্ছে, কিন্তু ধোঁয়া ঢুকছে আপনার নাকে, আপনার শরীরে—সেটাই হল প্যাসিভ স্মোকিং বা নিষ্ক্রিয় ধূমপান। এটা এমনি ধূমপানের মতই খারাপ। এতে আপনার ক্যান্সার ও অন্যান্য রোগের সম্ভাবনা বাড়ে। আর শিশুদের ক্ষেত্রে এটা বিশেষ করে ক্ষতিকর।

ধূমপানের সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সেই ধোঁয়া খেতে হবে এমন কথা নেই। ধোঁয়া বাতাসে থাকে, এবং বদ্ধ জায়গায় তা অনেকক্ষণই

অন্য লোক সিগারেট খাচ্ছে, কিন্তু ধোঁয়া ঢুকছে আপনার নাকে, আপনার শরীরে—সেটাই হল প্যাসিভ স্মোকিং বা নিষ্ক্রিয় ধূমপান।

ক্ষতিকর পরিমাণে থাকে। ঘরের মধ্যে কেউ ধূমপান করলে, একটা জানলা খোলা থাকলেও আড়াই ঘণ্টা মতো কিছু ধোঁয়া সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে।

প্যাসিভ স্মোকিং-এ আপনার শরীরে ৪০০০টি রাসায়নিক নানা মাত্রায় ঢোকে, তাদের অনেকগুলোই ক্ষতিকর, কয়েকটি ক্যান্সারের কারণও বটে। সিগারেট, বিড়ি, হুঁকো এসব যা দিয়েই ধূমপান করা হোক না কেন, প্যাসিভ স্মোকিং-এর ক্ষতি তাতে কমে না। এতে আপনার ফুসফুসের ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা বাড়ে। হৃদ্‌যন্ত্রের ধমনিগুলো বন্ধ হয়ে যাবার রোগ (করোনারি আর্টারি ডিজিজ)-এর সম্ভাবনা বাড়ে, আর তাতে হার্ট অ্যাটাক, বুকে ব্যথা (অ্যাঞ্জাইনা) ও হার্ট ফেইলইয়োর হতে পারে, হতে পারে ব্রেনের স্ট্রোক।

বাচ্চাদের জন্য প্যাসিভ স্মোকিং খুব খারাপ। তাদের আচমকা শয্যায় মৃত্যু (Sudden infant death syndrome)-এর সম্ভাবনা বাড়ে,

প্যাসিভ স্মোকিং-এ আপনার শরীরে ৪০০০টি রাসায়নিক নানা মাত্রায় ঢোকে, তাদের অনেকগুলোই ক্ষতিকর, কয়েকটি ক্যান্সারের কারণও বটে। সিগারেট, বিড়ি, হুঁকো এসব যা দিয়েই ধূমপান করা হোক না কেন, প্যাসিভ স্মোকিং-এর ক্ষতি তাতে কমে না।

হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, এমনকী মেনিঞ্জাইটিস-এর সম্ভাবনা বাড়ে। আর সাধারণ সর্দি-কাশি ও মধ্যকর্ণের সংক্রমণ যে বাড়ে সেটা সহজেই দেখা যায়। বাবা-মা বা বাড়ির অন্য কেউ ধূমপান করলে বাচ্চার এসব হতে পারে, উপরন্তু সেই বাচ্চার নিজে পরে ধূমপায়ী হবার সম্ভাবনা অন্যদের চাইতে তিনগুণ বেশি। আপনি যদি নিজে ধূমপান করেন তো বাচ্চাকে ধূমপান থেকে আটকানো শক্ত; আপনি ধূমপান ছেড়ে উদাহরণ স্থাপন করলে বাচ্চা সেটা মেনে নেবে।

তথ্যসূত্র: গ্রেট ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের জনশিক্ষামূলক ওয়েবসাইট। বিশদে পড়তে ক্লিক করুন—https://www.nhs.uk/chq/Pages/2289.aspx?CategoryID=87&SubCategoryID=871

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

হরেকরকম

ডিহাইড্রেশন বা জলশূন্যতা

শরীরে যতটা জল ঢুকছে তার চেয়ে বেশি বেরিয়ে গেলে হয় জলশূন্যতা। সময়মতো চিকিৎসা না হলে সমস্যা গুরুতর হয়, হতে পারে মৃত্যুও। শিশু আর বৃদ্ধদের জলশূন্য হওয়ার ঝুঁকি বেশি। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার রোগীদের শিক্ষামূলক তথ্যের সহায়তায় জলশূন্যতা কী জেনে নেওয়া যাক।

জলশূন্যতা হলে:

- জলতেষ্টা পায়।
- গাঢ় হলুদ আর কড়া গন্ধযুক্ত প্রস্রাব হয়।
- মাথাটা হালকাভাব লাগে।
- ক্লান্ত লাগে।
- মুখ, ঠোঁট আর চোখ শুকিয়ে যায়।
- সামান্য প্রস্রাব হয়, দিনে ৪ বারেরও কম।

কী করে জলশূন্যতার ঝুঁকি কমানো যায়?

- জলশূন্যতার কোনো উপসর্গ দেখা দিলেই জল বা অন্য তরল খেতে থাকুন। প্রথমে ছোটো ছোটো চুমুক দিয়ে খান, তারপর পারা গেলে বেশি-বেশি।
- বাচ্চাদের চামচ দিয়ে খাওয়াতে পারেন।
- সারাদিনে এতটা জল খাওয়া দরকার যাতে প্রস্রাব পরিষ্কার রঙের হয়।
- যখন বেশি ঘাম, বমি বা পাতলা পায়খানা হচ্ছে তখন ২৫০ মিলিলিটারের এক গেলাস জলে কানায় কানায় ভর্তি চায়ের চামচের দুই চামচ চিনি, তিন আঙুলের এক চিমটি নুন মিশিয়ে শরবত বানিয়ে খেতে থাকুন।

সকালের জল খাবার, দুপুরের ও রাতের খাবারের সঙ্গে জল খান। চা খেলেও সঙ্গে জল খাওয়া হয়। এমন খাবার দিন যাতে জলের ভাগ বেশি—স্যুপ, আইসক্রিম, জেলি, তরমুজের মতো ফল, ইত্যাদি।

যখন বেশি ঘাম, বমি বা পাতলা পায়খানা হচ্ছে তখন এক গেলাস জলে কানায় কানায় ভর্তি চায়ের চামচের দুই চামচ চিনি, তিন আঙুলের এক চিমটি নুন মিশিয়ে শরবত বানিয়ে খেতে থাকুন।

আপনার জলশূন্য হওয়ার ঝুঁকি বেশি, যদি আপনার:

- মধুমেহ বা ডায়াবেটিস মেলিটাস থাকে,
- যদি বমি বা পাতলা পায়খানা হতে থাকে,
- রোদে অনেকক্ষণ থেকে যদি আপনার হিটস্ট্রোক হয়,
- যদি খুব বেশি পরিমাণে মদ খেয়ে থাকেন,
- পরিশ্রম করার ফলে যদি খুব বেশি ঘাম হয়,
- শরীরের তাপমাত্রা যদি ৩৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা তার বেশি হয়।

রোগীরা অনেক সময় বুঝতে পারেন না তাঁরা পর্যাপ্ত তরল খাচ্ছেন কি না,

- দেখুন তাঁরা যাতে সকালের জলখাবার, দুপুরের ও রাতের খাবারের সঙ্গে জল খান।
- চা খেলেও সঙ্গে জল খাওয়া হয়।
- তাঁদের এমন খাবার দিন যাতে জলের ভাগ বেশি—স্যুপ, আইসক্রিম, জেলি, তরমুজের মতো ফল, ইত্যাদি।

হরেকরকম

আপনি আপনার খাবারের সঙ্গে প্রতিদিন ১০০ প্লাস্টিকের টুকরো খাচ্ছেন না তো?

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের Heriot-Watt বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বলছেন আমরা প্রতিদিন খাবারের সঙ্গে ১০০-টি প্লাস্টিকের ক্ষুদ্রাংশ খাচ্ছি। উৎস—প্লাস্টিক আসবাবপত্র, সিন্থেটিক ফেব্রিকের মিশ্রিত ধুলো। প্লাস্টিকের থালায় ২০ মিনিট ধরে খাবার খেলে গড়ে ১৪টি প্লাস্টিকের ক্ষুদ্রাংশ খাওয়া হয়ে যায়। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বলছেন বছর প্রতি ৬৮,৪১৫টি মারাত্মক প্লাস্টিক ফাইবার আমরা খেয়ে থাকি আমাদের খাবারের সঙ্গে। এমনকী সমুদ্রের মাসেলস শেলফিশেও একধরনের প্লাস্টিকের ফাইবার মিলেছে। গবেষকরা প্রতিটি শেলফিশেই কমপক্ষে ২টি মাইক্রো-প্লাস্টিক পেয়েছেন। তাই বিজ্ঞানীরা বলেছেন সমুদ্রের শেলফিশ খেলে বছরে ১০০টি প্লাস্টিকের টুকরো খাওয়া হয়ে যায়। বাড়ির বিভিন্ন প্লাস্টিক ফাইবার ও তার ধুলো থেকে ১৩৭৩১ থেকে ৬৮,৪১৫ প্লাস্টিক ফাইবার তারা খাবারের মাধ্যমে গ্রহণ করে। হেরিয়ট-ওয়াট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টেড হেন্‌রি জানিয়েছেন, আশ্চর্যজনকভাবে বাড়ির ধুলো আবর্জনা থেকে সামুদ্রিক খাবারে বেশি পরিমাণে প্লাস্টিক ফাইবার পাওয়া গেছে। মানব দেহে খাবারের তুলনায় শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে প্লাস্টিক ফাইবার শরীরে বেশি করে ঢুকছে। 'ফ্রেন্ডস অফ আর্থ' সংগঠনের কর্তা জুলিয়ান কিরবি জানালেন প্লাস্টিক মাইক্রোফাইবার আমাদের বাড়ির ধুলো-ময়লা-আবর্জনা আমাদের শ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করছে। আর এর উৎস হল গাড়ির টায়ার, কার্পেট, প্লাস্টিক আসবাবপত্র, প্লাস্টিকের জ্যাকেট বা ওই ধরনের জামাকাপড় থেকে। অবিলম্বে পরিবেশের ওপর, মানবদেহের ওপর প্লাস্টিক দূষণের প্রভাব সম্পর্কে জনগণ ও সরকারের সচেতন হওয়া দরকার। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

তথ্যসূত্র: *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, কলকাতা, ৬ এপ্রিল ২০১৮।

কর বসিয়ে জীবনশৈলীজনিত রোগ আটকানো যায় কি?

তামাক, মদ ও নরম পানীয়ের ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে সেই অর্থ স্বাস্থ্যখাতে খরচ করার দাবি উঠছে।

ল্যান্সেট-এর মতো মান্য পত্রিকায় ছ-টিরও বেশি গবেষণাপত্রে বিশেষজ্ঞরা মতামত জানিয়ে বলেছেন, দারিদ্র ও অ-সংক্রামক রোগ যেমন স্ট্রোক ও ডায়াবেটিসের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। অনেক শিল্পপতি ও রাজনীতিবিদ্ সাময়িকভাবে সরকারি কোষাগারে অর্থ জোগান কম হবে এই ভয়ে বা অজুহাতে তামাক, মদ ও নরম পানীয়ের ওপর কর বাড়ানোর বিরোধিতা করেন। কিন্তু স্ট্রোক ও ডায়াবেটিসের মতো অ-সংক্রামক রোগ দারিদ্রের বড়ো কারণ, বলেছেন আরটিআই-এর সহ-সভাপতি র‍্যাচেল নিউজেন্ট। আরটিআই হল সিয়াটেল-এর স্বাস্থ্যনীতি নিয়ে কাজ করা এক অলাভজনক সংস্থা।

দারিদ্রের মূল কারণ অসংক্রামক রোগ-ব্যাধি। *ল্যান্সেট*-এর ওই সংখ্যায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র প্রধান ডা. এধানম ঘেব্রিয়েসাস (Adhanom Ghebreyesus) মন্তব্য করেছেন, 'নিজের পকেট থেকে চিকিৎসার খরচ করার জন্য প্রতি বছর প্রায় ১০ কোটি মানুষ চরম দারিদ্রের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হচ্ছেন।' এর একটা বড়ো অংশই কিন্তু স্ট্রোক ও ডায়াবেটিসের মতো অ-সংক্রামক রোগের শিকার।

তাই ধূমপান, মদ্যপান, সোডা জাতীয় নরম পানীয়ের ব্যবহার কমানোর জন্য তার প্রতিটির ওপর অতিরিক্ত কর চাপিয়ে দেবার দাবি উঠছে। এটা দেখা গেছে এরকম ট্যাক্স চাপালে ধনীরা নেশার জিনিস কেনা যতটা কমান গরিবেরা তার চাইতে অনেকটাই বেশি কমান, ফলে তাঁরাই স্বাস্থ্য সুফল বেশি পান। কিন্তু সংশ্লিষ্ট শিল্পপতি ও অনেক রাজনীতিক এর বিরোধিতা করেছেন। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

তথ্যসূত্র: *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, কলকাতা, ৬ এপ্রিল ২০১৮ ।

ডাক্তাররাও ভেবে দেখুন

বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

একবার বোধনের আগেই প্রতিমা নিয়ে, আরও নির্দিষ্ট করে বললে 'অসুর' নিয়ে একটা চাপান-উতোর, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে অসুর বদল ইত্যাদি ঘটে গেল।

মহম্মদ আলি পার্কের পুজোর প্রতিমার অসুরকে 'অসৎ ডাক্তার' হিসেবে দেখানো নিয়ে ডাক্তারদের সংগঠনের প্রতিবাদ, সেই প্রতিবাদকে মান্যতা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কথায় অসুর বদল ইত্যাদি ঘটনার কথা আমরা গণমাধ্যমে জেনেছি।

সত্যি কথা বলতে কী ডাক্তারদের এই আচরণে একটু অবাকই হয়েছি। গোটা পৃথিবীই এক অদ্ভুত অসহিষ্ণুতার ভিতর দিয়ে পার হচ্ছে। প্রায় সকলেই আমরা নিজের নিজের বৃত্তে অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছি। কার্টুনের নির্ভেজাল ঠাট্টা সহ্য করার শিক্ষাও বিসর্জন দিয়েছি। ডাক্তাররা তো আকাশ থেকে পড়েননি। এই সমাজের প্রতিফলনে তাঁরাই বা বাদ যাবেন কেন? এসব জানা সত্ত্বেও মৌলবাদী ধর্মান্ধতা ছাড়া অসহিষ্ণুতা আমাদের পীড়া দেয় শুধু না, অবাকও করে।

বাংলার দুর্গোৎসবের ইতিহাসে, আরাধ্যার মুখের আদলে দেবীর মুখ আর বধযোগ্যের আদলে অসুর তৈরির একটা পরম্পরা আছে। ইংরেজ আমলে মহারানী ভিক্টোরিয়ার মুখের আদলে দেবীর মুখ তৈরি করে সাহেব-সুবো ডেকে এনে 'রায়বাহাদুর' পাবার পথটি প্রশস্ত করার প্রচলন খুব সাধারণ ছিল। অন্যদিকে সাহেবের আদলে 'অসুর' তৈরি করা হত স্বদেশিদের দুর্গাপুজোয়। প্রসঙ্গত আমরা মনে করতে পারি তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে তৈরি ঋতুপর্ণ ঘোষের ছবি 'অন্তরমহল''-এর কথা। তারাশংকরের গল্পটি কোনো ভিত্তিহীন কল্পনা-প্রসূত নয়। তার ভিত্তি ছিল তখনকার পুজো। এই আরোপ কখনো শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসার আবার কখনো ঘৃণার। কিন্তু একটা কথা বোধ হয় অস্বীকার করা যাবে না যে মানুষের নিজস্ব ইচ্ছাপূরণের এই স্পর্শ হিন্দুর নিজস্ব দুর্গাপুজোকে সাধারণের দুর্গোৎসবে পরিণত করেছে।

মহম্মদ আলি পার্কের 'অসুর' কিন্তু এক অর্থে সেই ইচ্ছাপূরণেরই প্রকাশ। পাশাপাশি একথাও ঠিক যে বিদেশি শাসককে হননের ইচ্ছা আর স্বদেশি 'ডাক্তার' (অপরিহার্য অঙ্গ সমাজের) হননের ইচ্ছা এক পর্যায়ে পড়ে না। তারা যে আমাদেরই ঘরের ছেলে।

কিন্তু ডাক্তারদেরও বোধ হয় করি অসুর কোনো বার্তা দিয়ে গেল। তাঁরা কি ভেবে দেখবেন জনমানসে তাঁদের সম্মানটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? নিজেদের চেহারাটা আয়নায় ঠিক কেমন? আত্মপক্ষ সমর্থনের আগে আত্মসমীক্ষা করাটা জরুরি কি না?

আর পাঁচটি পেশার সঙ্গে ডাক্তারিকে গুলিয়ে ফেললে ঠিক হবে না। একেবারে রক্ত-মাংসের মানুষের বাঁচা-না-বাঁচা নিয়ে আর কোনো পেশায় এই ভাবে নাড়াচাড়া করতে হয় না। আর তাই পেশাগত হ্যাজার্ডও এই পেশায় সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। একজন ডাক্তারকে যত সহজে সাধারণ মানুষ 'ভগবান' ভেবে নেন, আর কোনো পেশায় কি তেমনটি হয়? ডাক্তার তাঁর অধীত বিদ্যাপ্রয়োগে সফল হলে, কতভাবে না মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা জানায়। আমার পরিচিত একটি তিনদিনের শিশুকে হার্টে বাইপাস সার্জারি করে ডাক্তার বাঁচিয়েছিলেন বলে তার বাবা মা বাচ্চাটির নাম রেখেছেন ডাক্তারের নামে। এই শ্রদ্ধা, এই স্মরণ কি কোনো টাকা দিয়ে কেনা যায়? না কি ভগবানকে স্মরণের চেয়ে কম?

একথা ভুলে যাওয়া যাবে না যে আমাদের ঘরের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্ররা মূলত রাষ্ট্রের খরচে ডাক্তারি পাশ করেন। রাষ্ট্রের সেই টাকায় আছে গ্রাম-গ্রামান্তরের নিরক্ষর কৃষকটির করের ভাগ। আর তাই সেই মানুষটির চিকিৎসার প্রয়োজনে ডাক্তারকে হাজির থাকতে হবে। এর মধ্যে কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই। ডাক্তারি পেশায় ডাক্তারের কোনো অবস্থাতেই নিজের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকার উপায় নেই। সামাজিক দায়বদ্ধতাকে মেনে নিতেই হবে। এটাকে পেশাগত 'হ্যাজার্ড' মনে হলেও সত্যটা পালটায় না।

. . . জনসাধারণের জন্য ফল একই। অবস্থা এমন যে, আর কখনো আমরা সুস্থ কোনো স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব কি না জানি না। এই ভাঙন একদিনে বা একটা দুটো কারণে ঘটেনি। . . .

আজকে ২০১৮ তে পশ্চিমবঙ্গের গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যাকে বলে একেবারে ভগ্নদশায় এসে পৌঁছেছে। সরকারি, বেসরকারি দুটো ব্যবস্থাই। দুটো দু-ভাবে। কিন্তু জনসাধারণের জন্য ফল একই। অবস্থা এমন যে, আর কখনো আমরা সুস্থ কোনো স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব কি না জানি না। এই ভাঙন একদিনে বা একটা দুটো কারণে ঘটেনি। অনেকদিন ধরে অনেকগুলি কারণের সমন্বয়ে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। নিশ্চিত করেই বলা যায়, অনেকগুলি কারণে চিকিৎসা

ব্যবস্থায় ডাক্তারদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কিন্তু গোটা ব্যবস্থাটিতে যেহেতু ডাক্তারেরই সবচেয়ে জরুরি ভূমিকা তাই কিছু কিছু কারণ তাঁরা নিশ্চিতভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। বলতে দ্বিধা নেই, সেই ভূমিকা তাঁরা পালন করেননি এবং সেই নিষ্ক্রিয়তা ব্যবস্থাটিকে দ্রুত ক্ষয় করতে সাহায্য করেছে। আমাদের বাল্যকালে মধ্যবিত্ত চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল কলেজ, নীলরতন, আর. জি. কর কিংবা ন্যাশানাল, পি.জি.-তেই যেতেন। গোটা শহরে দু-টি বা তিনটি হাতে গোনা বে-সরকারি হাসপাতাল বা নার্সিং হোম ছিল। শিল্পপতি, চিত্রতারকারা যেতেন সেসব জায়গায়। সরকারি হাসপাতালে বাড়াবাড়ি ছিল না অর্থাৎ হাড়-হিম করা এয়ারকন্ডিশনার চলত না, কিন্তু পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, যথাযথ খাদ্য, প্রতিদিন বিছানায় চাদর পালটানো, ডিগ্রিপ্রাপ্ত নার্সের নজরদারি--এসব ছিল। সেসব আজ গল্প মনে হয়।

সত্তর দশকে বিকল্প বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তৈরি হতে শুরু হল। এই বিকল্প ব্যবস্থার অনেকগুলি নার্সিং হোমের মালিকানা ডাক্তারদের ছিল। তাছাড়া সরকারি ক্ষেত্রে যে টাকা পেতেন, তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা তাঁরা পেতে থাকেন বেসরকারি ক্ষেত্রে। আর সেই কারণেই অলিখিত চুক্তি অনুযায়ী রোগী এনে নার্সিং হোমের লাভের দিকটিতেও তাঁদের নজর দিতে হল। শুরু হল ডাক্তারির বাইরে ডাক্তারদের কাজ। সেইসময়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি মেডিক্যাল কলেজের অপারেশন থিয়েটার এর যন্ত্রপাতি এনে নিজস্ব নার্সিং হোমে ডাক্তার ব্যবহার করছেন।

. . . অলিখিত চুক্তি অনুযায়ী রোগী এনে নার্সিংহোমের লাভের দিকটিতেও তাদের নজর দিতে হল। শুরু হল ডাক্তারির বাইরে ডাক্তারদের কাজ। সেইসময়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি মেডিক্যাল কলেজের অপারেশন থিয়েটার-এর যন্ত্রপাতি এনে নিজস্ব নার্সিংহোমে ডাক্তার ব্যবহার করছেন।

এই অনৈতিকতার মাশুল আজও ডাক্তারদের দিতে হচ্ছে। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই, কোথাও-না-কোথাও ডাক্তার নিগ্রহের খবর।

কোনো রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার পক্ষে খবরগুলি ভালো নয়। কোনোভাবেই জনগণের এই নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়াকে সমর্থন করা যায় না। কিন্তু এ কথা বলতেই হবে, সত্তর দশক থেকে শুরু হওয়া অনৈতিকতার মাশুল দিচ্ছেন আজও ডাক্তাররা রোগীর আত্মীয়ের হাতে নিগৃহীত হয়ে। অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো দেখা যায় যে আসলে ত্রুটি ছিল ব্যবস্থায়। কিন্তু ডাক্তাররা যে ব্যবস্থা বা সিস্টেমকে দোষ দিয়ে নিজেদের দায়বদ্ধতা থেকে অব্যাহতি নিয়ে নেন, সে কথা সাধারণ মানুষ তাঁদের কাণ্ডজ্ঞান থেকেই বুঝতেই পারেন। আর বেসরকারি ব্যবস্থাকে মদত দিতে দিতে আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে প্রশাসন থেকে শুরু করে আইন আদালত কিছুই আর তাদের যথেচ্ছাচারকে বেঁধে রাখতে পারছে না।

আজকাল প্রায় প্রত্যেক বেসরকারি হাসপাতালের নিজস্ব ওষুধের দোকান থাকে। ডাক্তাররা একই ওষুধ বিভিন্ন নামে দু-দিন অন্তর পালটে দেন। ফলে একটা পাতা কেনা হল, তার তিনটে ওষুধ খরচ হল। বাকি সাতটা ওষুধ, ওষুধের দোকানে ফিরে এল। আবার একই ওষুধ অন্য কোম্পানির আরও দশটা কিনতে হল। কিংবা আই. সি. ইউ.-তে এক ডাক্তারের ধরা যাক তিনজন রোগী আছেন। তিনি একবার এসে তিনজনের কাছ থেকেই তিনবার ফি নিচ্ছেন। 'পেসমেকার' বসানোর কথা তো সবাই জানেন। কেবলমাত্র দস্তুরি পাবার লোভে যে রোগীর দরকার নেই তাঁকেও পেসমেকার দিয়ে দেওয়া হয়। ওষুধের কোম্পানির দালালি করা যে আজকের অনেক ডাক্তারের অন্যতম কাজ একথা ডাক্তাররাও স্বীকার করেন।

নার্সিং হোমের মালিকের নির্দেশে ডাক্তার, যে কোনো সমস্যা নিয়ে এলেই মহিলাদের (৪০ এর নীচে বয়স) জরায়ু বাদ দিয়ে দিচ্ছেন। ভবিষ্যতে সেই মহিলাদের যে কী অবস্থা হবে ভেবে শিউরে উঠেছেন তিনি। তারপর অত্যন্ত ব্যথিত গলায় বললেন, 'আমার ছাত্ররা এই কাজ করছে। আমি দেখে এলাম।'

একজন অভিজ্ঞ স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ আমাকে বলেছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। জেলার কোনো এক নার্সিং হোমে তিনি দেখেছিলেন সরকারি বিমার টাকা আত্মসাৎ করার জন্য নার্সিং হোমের মালিকের নির্দেশে ডাক্তার, যেকোনো সমস্যা নিয়ে এলেই মহিলাদের (৪০ এর নীচে বয়স) জরায়ু বাদ দিয়ে দিচ্ছেন। ভবিষ্যতে সেই মহিলাদের যে কী অবস্থা হবে ভেবে শিউরে উঠেছেন তিনি। তারপর অত্যন্ত ব্যথিত গলায় বললেন, 'আমার ছাত্ররা এই কাজ করছে। আমি দেখে এলাম।' জানতে ইচ্ছে করে, এই কাজের দায় তাঁরা কার ওপর বা কোন সিস্টেমের ওপর চাপাতে চান? নৈতিকতার কোন মানদণ্ডে এঁদের এইসব কাজকে সমর্থন করা যায়? অনেক ডাক্তারকে আমি নিজে বলতে শুনেছি 'সরকার আটকাক না।' স্বীকার করতেই হবে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা এখনও অন্তত এই ব্যাপারে ততটা সবল নয়। কিন্তু সমস্ত আইন সমস্ত আদালতের নির্দেশ, প্রশাসন—এর উপরে আর একটা বিষয় আছে। যার নাম বিবেক বা নৈতিকতা। সেই নৈতিকতার কাছে আজকের অধিকাংশ ডাক্তারের আর কোনো ঋণ নেই। মানুষের করের

টাকায় ডিগ্রি পেয়ে, মানুষকে বেমালুম ভুলে যাওয়ার দৃষ্টান্ত তাঁরা যেভাবে সমাজের সামনে রাখেন তাতে আর কোনো অজুহাত যথেষ্ট হবে বলে মনে হয় না। এখন একটু অভিজ্ঞ ডাক্তারের গড় ফি হয়েছে হাজার টাকা। এমনকী এই শহরে কোনো কোনো ডাক্তারকে তিন থেকে চার হাজার টাকা লাগে দেখাতে। সরকারি ব্যবস্থাকে তুলে দিতে সাহায্য করে (নিষ্ক্রিয়তাও একরকম পরোক্ষ সহায়তা) এমন যথেচ্ছ টাকা দাবি করার পর, টাকা এবং সম্মান দুটোর দাবি করা কি সংগত?

যদিও সকলেই যে এই রসাতলে তলিয়ে যাননি, এটাও সত্য। মানুষের বিবেক এবং ন্যায়বোধের দায়বদ্ধতাকে যে শেষ পর্যন্ত কোনো 'সিস্টেম''-ই মেরে ফেলতে পারবে না, এটা বোধহয় তারই দৃষ্টান্ত। বেশ কিছু ডাক্তারকে চিনি, যারা গাঁটের কড়ি খরচ করে আজ

ডাক্তার, রোগী ও তার পরিজনের কাছে রোগের বৃত্তান্ত তার চিকিৎসা ও চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে একটি বাক্যও খরচ করেন না। অনাবশ্যক মনে করেন। যদিও রোগীর ও পরিজনের অধিকার আছে তা জানার। দেখেন এবং তেমন কিছু না পাওয়া গেলে, কিছু টেস্ট করিয়ে ছেড়ে দেন। নিদেনপক্ষে দু-দিনের বেড ভাড়া ও আনুষঙ্গিক খরচ জোগাতেই হয়।

ডুয়ার্সে বন্ধ চা বাগানে তো কাল সুন্দরবনের বানভাসি প্রত্যন্ত গ্রাম করে বেড়াচ্ছেন। কেবল রোগী দেখা, কেনা দামে ওষুধ দেওয়া নয়, স্থানীয় ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণটুকুও দিয়ে দেন, যাতে তাঁরা প্রথম চোটে খানিকটা সামলে দিতে পারেন। বলা বাহুল্য প্রয়োজনের তুলনায় এঁদের সাধ্য কম। এবং এঁরা একেবারেই ব্যতিক্রমী।

ডাক্তার ছাড়া আমরা অচল। আমাদের ছাড়াও ডাক্তার অচল। তাই সম্পর্কটা ঝগড়া-ঝগড়ির বদলে পারস্পরিক সহানুভূতির হওয়াই কাম্য। কলকাতার এক নিকটস্থ মফস্বল শহরে ডাক্তার দেখাতে হলে, সেখানকার একটি নার্সিং হোমে আগে ভর্তি হতে হয়, তারপর ডাক্তার দেখেন। যদি তেমন কিছু না-ও হয়, অর্থাৎ নার্সিং হোমে আটকে থাকার মতো কোনো ব্যাধি নাও হয়, তাহলে কয়েকটা পরীক্ষা করিয়ে রোগীকে নিয়ে আসতে হয়। সেক্ষেত্রে রোগী বা বাড়ির লোক একদম বিনা কারণে অন্তত দু-দিনের নার্সিং হোমের বেড ভাড়া ও আনুষঙ্গিক খরচ দিতে বাধ্য হতে হয়। ডাক্তারের ফি-এর কথা তো বলাই বাহুল্য। এইরকম একটা অদ্ভুত উলটো ব্যবস্থা অসহায়ভাবে মানুষ মানতে বাধ্য হচ্ছেন। বছরের পর বছর। 'অসুখ' জিনিসটা এমনই যে, ডাক্তারের কাছে যেতে মানুষ বাধ্য থাকেন। গ্রামের অবস্থা একভাবে খারাপ। সেখানে হেলথ সেন্টার আছে তো ওষুধ নেই। ওষুধ আছে তো ডাক্তার নেই। ডাক্তার আছে তো তিনি সপ্তাহে দু-দিন আসেন। কলকাতা শহর আর মফস্বল টাউনের অবস্থা অন্যভাবে খারাপ। সেখানে ডাক্তার থাকলেও তাঁর কাছে যেতে আর চিকিৎসা শুরুর আগের খরচ মেটাতেই ঘটি-বাটি বিক্রির দশা। একথা আজ কারও অজানা নয় যে, ক্লিনিকের দস্তুরি ডাক্তাররা পেয়ে থাকেন।

সর্বত্রই রোগী ও তার পরিবারকেই একমাত্র সবকিছু মেনে নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। তাদের হাতে কোনো চালিকা শক্তি নেই। জমে আছে সেই রাগ। ঠকে যাবার বোধ নার্সিং হোম ভাঙচুরের মধ্যে, ডাক্তার নিগ্রহের মধ্যে প্রকাশ পায়, কখনো কখনো ভুল জায়গায়। তাকে সমর্থন না করেও বলা যায়, সেটা এই অবস্থায় একভাবে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

আরও একটা বিষয় কেবল আমাদের দেশেই সম্ভব। ডাক্তার, রোগী ও তার পরিজনের কাছে রোগের বৃত্তান্ত তার চিকিৎসা ও চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে একটি বাক্যও খরচ করেন না। অনাবশ্যক মনে করেন। যদিও রোগীর ও পরিজনের অধিকার আছে তা জানার। দেখেন এবং তেমন কিছু না পাওয়া গেলে, কিছু টেস্ট করিয়ে ছেড়ে দেন। নিদেনপক্ষে

নিজেদের সম্মান রাখতে গেলে যে অন্যের সম্মানের কথাও ভাবতে হয়, অন্যের অধিকারের দিকেও সজাগ দৃষ্টি দিতে হয়, এটা ভুলে গেলে চলে কী করে?

দু-দিনের বেড ভাড়া ও আনুষঙ্গিক খরচ জোগাতেই হয়। এই উলটো নিয়ম বছরের পর বছর চলছে। সেখানে রোগীরা রিসিভিং এন্ড (receiving end)-এ। সেই অধিকার খর্ব করার অধিকার তিনি কোথায় এবং কেন পেলেন জানা নেই। বেসরকারি হাসপাতালেও ছবিটা এই ক্ষেত্রে একইরকম। আমরা ধরেই নিয়েছি, কোথাও কোনো উত্তর দেবার বা পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব ডাক্তারের নেই। এর ফলে যে রোগী আর তার পরিজনদের প্রতি ডাক্তারের তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায় সেটা কি তাঁরা ভেবে দেখেছেন? তৃতীয় বিশ্বেরও অন্যত্র ছবিটা কিন্তু এই রকম নয়।

প্রকাশ্য বারোয়ারি পুজোয় একটি বিশেষ পেশার মানুষকে বধযোগ্য হিসাবে ঘোষণা করলে, সে পেশার মানুষ অসম্মানিত বোধ করেন। কিন্তু নিজেদের সম্মান রাখতে গেলে যে অন্যের সম্মানের কথাও ভাবতে হয়, অন্যের অধিকারের দিকেও সজাগ দৃষ্টি দিতে হয়, এটা ভুলে গেলে চলে কী করে? কোনো অসহায় অবস্থায় পৌঁছালে আমাদের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রদের আমরাই কাঠগড়ায় তুলি সেটা ভাবার সংকেতই কি দিয়ে গেল না মহম্মদ আলি পার্কের ঘটনা? স্বাস্থ্যের বুত্তে

লেখক প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক এবং মানবাধিকার কর্মী।

চিকিৎসাব্যবস্থার সংকট

ডা. বিষাণ বসু

চিকিৎসকের সংকট? নাকি চিকিৎসাব্যবস্থার সংকট? আমরা কি সিস্টেমকেই চ্যালেঞ্জ করার কথা ভাবব না এখনও?

"The truth was that I had no idea how to write about it, what method to use, what approach to take."

"Unable to find words for these new feelings and emotions, unable to find emotions for these new words, we no longer knew how to express ourselves; but we were gradually immersed in the atmosphere of a new way of thinking."

Svetlana Alexievich (Chernobyl Prayer)

চিকিৎসককে ঘিরে ধরে সমবেত গালিগালাজ। সেই থেকেই শুরু। বাড়তে বাড়তে চিকিৎসকের গায়ে হাত। বাড়তে বাড়তে চিকিৎসকের মুখে গু মাখানো। অথবা চিকিৎসকের স্ক্যালপেল ছিনিয়ে তাঁর উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়া। অথবা বাড়তে বাড়তে কর্তব্যরতা নার্সের ইউনিফর্ম ছিঁড়ে নেওয়া। অথবা মহিলা ডাক্তারের গায়ে হাত। গ্লাসের অর্ধেক ভর্তি দেখতে চাইলে বলতেই পারেন, অন্তত চিকিৎসাক্ষেত্রে, মহিলা পেশাদারেরা, তাঁদের সমকক্ষ পুরুষদের তুলনায়, জনগণের চোখে,সম্মানে সমান না হতে পারলেও, অপমানে বা লাঞ্ছনায় সমান হয়ে উঠলেন। নাকি শুরু তারও আগে।

যখন, ব্যাবসা আর বিজ্ঞাপনী তাগিদ, পুরো সমাজকেই করে ফেলল চিকিৎসনীয়? যার অবধারিত অঙ্গ হিসেবে আপনিও সর্বদাই অসুখবিসুখ নিয়ে অবসেসড হয়ে পড়লেন। আর এই অবসেশনকে ভাবতে শুরু করলেন স্বাস্থ্যসচেতনতা। আর সেই সুবাদে, আপনি স্বাস্থ্যপত্রিকা বা ইন্টারনেট ঘেঁটে নিজেকে ভাবতে শুরু করলেন বিশেষজ্ঞ। আর, যে জিনিস নাকি আপনি নিজেই জানেন, অন্তত জানেন বলে বিশ্বাস করেন, সেই জ্ঞানের চর্চা করে একজন যদি জীবিকানির্বাহের চেষ্টা করেন, তাঁর প্রতি আলাদা করে কোনো সম্মান বা সমীহের কোনো কারণ আছে কি?

সমাজে ডাক্তারের সম্মান বা সহজ আক্রমণযোগ্য হিসেবে ঠাউরানোর শুরু কি এই স্বাস্থ্যবিষয়ে অতিসচেতনতা?

নাকি, এসবের মূলে সেই আজব অর্থনৈতিক নীতি, যাতে ধনীদরিদ্রের ফারাক উত্তরোত্তর বাড়তে থাকলেও, দরিদ্র ক্রমশ অতিদরিদ্রে বা হতদরিদ্রে পরিণত হলেও, সরকার অর্থনৈতিক উন্নতির উজ্জ্বল ছবি তুলে ধরতে পারেন? এমনকী, এই ক্রমবর্ধমান ফারাককে, অর্থনৈতিক উন্নতির অন্যতম লক্ষণ বা অবশ্যম্ভাবী শর্ত হিসেবে দাবি করতে পারেন? সেই নীতি, যাতে মানুষ দু-বেলা দু-মুঠো না খেতে পেলেও, সরকারবাহাদুর মানুষের খাদ্যের নিরাপত্তার চাইতে কর্পোরেটদের ট্যাক্স ছাড়ের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন। সেই নীতি, যাতে দেশের মানুষ বিনা চিকিৎসায় মরতে বসলেও, সেই চিন্তা ছেড়ে, সরকার হেলথ ট্যুরিজম চালিয়ে বিদেশি মধ্যবিত্তকে চিকিৎসাপরিষেবা দিয়ে বেশ টু-পাইস কামানোর স্বপ্ন দেখেন।

আমাদেরই কি বুঝতে দেরি হয়ে গিয়েছিল?

আমাদের কি তখনই সচেতন হওয়া উচিত ছিল, যখন থেকে এমন আলোচনা শুরু হল যে সরকারি হাসপাতাল সাক্ষাৎ নরক অথবা যমের দক্ষিণ দুয়ার? ঢালাও বেসরকারিকরণের ঢেউ যেদিন স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এসে আছড়ে পড়ল, আমরা কি কিছুই বুঝতে পারিনি?

অবচেতনে বেসরকারিকরণের সমর্থন গড়ে তোলা একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রয়াস? আর এই অপপ্রয়াসের অন্যতম অঙ্গ, সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার নিন্দার পাশাপাশি, বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞাপন?

আমরা কি বুঝতে পারিনি যে, ঢালাও বেসরকারিকরণের অর্থ, নিম্নবিত্ত মানুষের সামনে থেকে চিকিৎসার সুযোগ ছিনিয়ে নেওয়া? আর, এই অধিকার ছিনিয়ে নিলে জনরোষ অবশ্যম্ভাবী?

এও কি আমরা অনুমান করতে পারিনি, যে, অবচেতনে বেসরকারিকরণের সমর্থন গড়ে তোলা একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রয়াস? আর এই অপপ্রয়াসের অন্যতম অঙ্গ, সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার নিন্দার পাশাপাশি, বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞাপন? যেমন, নেতাদের চিকিৎসার কারণে কর্পোরেট হাসপাতালমুখী হওয়া। কিংবা, সরকারি শীর্ষ নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে বেসরকারি চিকিৎসকদের আলাদা করে গুরুত্ব দেওয়া। আর, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের পক্ষে জনমত সংগঠন যতখানি ধূর্ততার সাথেই করা হোক না কেন, জনরোষ অবশ্যম্ভাবী। আর, সেই জনরোষ সামলানোর সহজতম পথ, রোষের

অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়া। ঘুরিয়ে দেওয়া হবে এমন কিছু পেশাদারের দিকে, যাঁরা থাকবেন রোষের মুহূর্তে উন্মত্ত জনতার চোখের সামনে, হাতের সামনে। যেমন—ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী।

আমরা কি বুঝতে পারিনি এইসব?

আসলে, খুব দ্রুত বদলে যাওয়া একটি সংগঠিত অপপ্রয়াসের মোকাবিলা করার মতো ইতিহাসবোধ অথবা তত্ত্বের জ্ঞান, কোনোটাই হয়তো আমাদের ছিল না। কথার অবতারণা একারণেই, কেননা আমি বিশ্বাস করি, ঘটনার অতীতক্রম যদি সঠিক অনুধাবন করতে না পারি, তাহলে ভবিষ্যতের আঁচ পাওয়া অসম্ভব। সেইজন্যেই ভাবতে বসি। ভাবি, নিজের মতো করে সমস্যাটা সাজিয়ে লিখি। সমস্যার গতিপথ ট্র্যাক করে গোড়ায় পৌঁছোতে চাই। কিন্তু, পারি না। আর, লেখার শুরুর উদ্ধৃতিটা দেখতে পাই। জানি, কিছু কিছু সমস্যা এতই হতচকিতকারী, যে নোবেলবিজয়িনীও গুছিয়ে লিখতে পারেন না আমজনতা, মানে আমরা তো কোন ছার!! অথচ, না পেরেও তো উপায় নেই।

চিকিৎসাব্যবস্থার সংকট আর চিকিৎসকের সংকট। সবাই দ্বিতীয়টা নিয়েই কথা বলছেন। চিকিৎসকবন্ধুরা শঙ্কিত, চিন্তিত, বিরক্ত, হতাশ, ক্রুদ্ধও। অনেক অচিকিৎসক বন্ধু সহমর্মী, সমব্যথী। আর কিছু মানুষ, যাঁরা ঠিক বন্ধু নন, তাঁরা মজা পাচ্ছেন। এমনকী, দুর্ঘটনায় চিকিৎসক ছাত্র মারা গেলেও বলছেন, এদের মরাই ভালো ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু, ক-জন বলছেন, ভাবছেন প্রথম সমস্যাটার কথা? অথচ, চিকিৎসাব্যবস্থার সংকটের বিষয়ের মোকাবিলা না করে চিকিৎসকের পেশাগত সংকটমোচন কি আদৌ সম্ভব?

যাঁরা এই পেশায় আসার আগেই আতঙ্কিত বোধ করছেন, তাঁদের বলি, কোনো পেশাই কি সুরক্ষিত থাকবে শেষ পর্যন্ত? এই সমাজব্যবস্থায়, কোনো সৎ পেশারই কি সম্মান বজায় থাকা সম্ভব?

আমরা চিকিৎসকেরা কি সমষ্টিগতভাবেই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছি? ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন বিল নিয়ে আমরা যতবার যত উৎসাহের সাথে পথে নামছি, ২০১৭ সালের নতুন জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি নিয়ে আমাদের প্রতিবাদ কোথায় তেমন? অথচ, এই স্বাস্থ্যনীতি লাগু হলে তার কুপ্রভাব তো সুদূরপ্রসারী। সরকার সাধারণ মানুষের চিকিৎসার দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছেন, মোটামুটি কথাবার্তা সেরকমই। আমরা তার প্রতিবাদ করব না? পথে নামব না? যে সরকার সাধারণ নাগরিকের চিকিৎসার দায়িত্ব নেয় না, আমরা আশা করব যে সেই সরকার আমাদের, চিকিৎসকদের, স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবেন? দিবাস্বপ্নেও তো এর চাইতে বেশি বাস্তবভিত্তি থাকে।

যাঁরা দেশ ছেড়ে অন্যত্র পালাতে চাইছেন, তাঁদের ভাবনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলি, পালিয়ে পিঠ বাঁচতে পারে, সমস্যার সমাধান হয় না।

যাঁরা এই পেশা ছাড়তে চাইছেন, তাঁদের জন্যেও সেই একই কথা।

যাঁরা এই পেশায় আসার আগেই আতঙ্কিত বোধ করছেন, তাঁদের বলি, কোনো পেশাই কি সুরক্ষিত থাকবে শেষ পর্যন্ত? এই সমাজব্যবস্থায়, কোনো সৎ পেশারই কি সম্মান বজায় থাকা সম্ভব? মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পেশার সম্মান ধ্বংস তো এই ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান শর্ত।

বিদ্যাচর্চার সম্মান বজায় থাকলে কি ফিল্মস্টার বুদ্ধিজীবীর তকমা পেতে পারেন? নাকি জনপ্রিয় ক্রিকেটারের জীবনচরিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ঠাঁই পেতে পারে?

জ্ঞান বা বিদ্যার চর্চা তো বিপজ্জনক। সেই কবেই না হীরকরাজা বলেছিলেন, যে যত বেশি জানে, সে তত কম মানে। সেই ঝুঁকি নিতে রাজা কিংবা রানি কেউই চান না।

তার চাইতে, কর্পোরেটের বেতনভুক কর্মচারী হোক সবাই। মেধা কাজে লাগুক বেসরকারি মুনাফাবৃদ্ধিতে। ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলোও যাক বদলে। আপনি আর কপনি, ব্যস। ঝলমলে বিজ্ঞাপন তো ক্রমশই বাড়াচ্ছে লোভ। ফ্ল্যাট হোক আরও বিলাসবহুল। গাড়ি হোক আরও দ্রুতগামী। পরনের কাপড় হোক ব্র্যান্ডেড, সম্ভব হলে ডিজাইনার। সিগনালে গাড়ি দাঁড়ালে, ছেঁড়া কাপড়ে বাচ্চারা ভিক্ষে চাইলে, আপনার সন্তান হোক বিস্মিত, কেননা তার প্রাইভেট স্কুলে, উচ্চমধ্যবিত্ত ভিন্ন বাকি সকলেরই নো এন্ট্রি।

আপনি যদি উপরের ব্যাপারগুলো নিয়ে ভাবতে না বসেন, তাহলে, বোধ হয়, চিকিৎসাব্যবস্থার সংকটের মূলে আপনি পৌঁছোতে পারবেন না।

গ্রামশি-কথিত হেজিমনির তত্ত্বই বলুন, অথবা লায়োটার্ডের উত্তরাধুনিক গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ, দুইয়েরই মূল কথা একই। প্রচলিত ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে আমাদের চিন্তাপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সদাই তৎপর। প্রচলিত ভাবনায় চলতে থাকলে এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ নেই।

তাই, প্লিজ, টিভি সিরিয়াল বা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ছেড়ে একটু ভাবতে বসুন। একটু পড়াশোনাও করুন, পারলে। জোড়াতালি দিয়ে সমস্যার আপাতসমাধান খুঁজে মুক্তি নেই। প্রচলিত সিস্টেমটাকেই চ্যালেঞ্জ করা খুব প্রয়োজন এখন। তার আগে প্রয়োজন সমষ্টিগত চিন্তাপদ্ধতির বদল। তা নইলে উত্তরণের পথ কোথায়? স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. বিষাণ বসু, এমবিবিএস, এমডি, একটি সরকারি হাসপাতালে রেডিয়োথেরাপি বিভাগে অধ্যাপনা করেন।

দেশবিদেশের বস্তিজীবন ও স্বাস্থ্য সমস্যা

ধ্রুবজ্যোতি দে

ঝুগ্‌গি-ঝোপড়ি, বস্তি ও কলোনি, রাজধানী দিল্লি

(১)

সময় ২০১১ সাল। কৈলাস সত্যার্থী তখনও নোবেল শান্তি পুরস্কার পাননি। তাঁর '*বচ্‌পন বাঁচাও আন্দোলন* (*বি.বি.এ.*)'-এর কর্মীদল দিল্লি থেকে ১২০০ শিশুশ্রমিক উদ্ধারের প্রতিফল পেল। পূর্ব দিল্লির খুরেজিতে শিশুপাচারকারীদের হাতে আক্রান্ত হয়ে, শরীরে গভীর ক্ষত নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন চার জন, মারাও গেলেন দু-জন (সূত্র: জি নিউজ)। ২০১০-১৪-র মধ্যে *বি.বি.এ.*-র উদ্যোগে দিল্লিতে উদ্ধার হওয়া ২২২২ জন শিশুশ্রমিকের ৮৩% কাজ করত বসত এলাকায় গড়ে ওঠা বিধিবহির্ভূত ছোটো ছোটো শিল্পে, যেমন পোশাক, ব্যাগ, জুতো ইত্যাদি কারখানায় বা ধাবায়। সেনসাস ২০১১-র হিসাবে দিল্লিতে ৫-১৪ বছর বয়সি এরকম শিশুশ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৩৯ হাজার।

ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেল্‌থ সার্ভে-৩ অনুযায়ী ২০০৫-০৬ সালে দিল্লিতে ৫-১৪ বছর বয়সি শিশুদের ৮.৯% পরিবারের বাইরে কারও কাছে কাজ করত কোনোরকম মজুরি ছাড়াই এবং ১.৭% শিশু কাজ করত মজুরির বিনিময়ে (সূত্র: *চিল্ড্রেন ইন ইন্ডিয়া* ২০১২, *গভঃ অফ ইন্ডিয়া*)। মজুরি অবশ্য কোনোমতেই সপ্তাহে ৫০-১০০ টাকার বেশি নয় (*হিন্দুস্থান টাইমস*, ১১.০৬.২০১৩)। ২০১১-তে পাঞ্জাবি বস্তি থেকে উদ্ধার হওয়া ৮ বছরের শিশুশ্রমিক রবি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলে, 'আমরা ভোর থেকেই কাজ শুরু করতাম। এত খাটতে হত যে দিনরাত তফাত বুঝতাম না। মাইনে চাইলে মালিক বলত, 'যখন ঘরে ফিরবি তখন পয়সা পাবি।' কিন্তু সে সুযোগ তাদের হত না।

ওই একই সময়ে পাহাড়গঞ্জের একটি ব্যাগ কারখানার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে ৩১-জন শিশুশ্রমিক উদ্ধার হয়। দেখা যায় প্রত্যেকেই প্রবল সর্দিকাশিতে ভুগছে এবং তাদের কোনো ওষুধই দেওয়া হয়নি। দিনে দু-বার খেতে দিয়ে তাদের ১৪-১৫ ঘণ্টা খাটিয়ে নেওয়া হত, কোনোরকম মজুরি ছাড়াই। পরিবারের বাইরে থাকলেও এদের অনেকেরই পরিবার থাকে দিল্লিরই কোনো বস্তি এলাকায়। কিছু আসে পাচার হয়ে অথবা নিজেরাই চলে আসে কাজের সন্ধানে। দিল্লিতে শিশুশ্রমিকদের এই শতকরা হার সারা ভারতের থেকেও বেশি এবং সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকার মধ্যে গুজরাটের পরেই দিল্লির স্থান। আর দিল্লি এমন একটি রাজ্য যা একই সাথে একটি নগরপুঞ্জও (*আর্বান অ্যাগ্লোমারেশন*) বটে, যার পোশাকি নাম '*ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি অফ দিল্লি (এন.সি.টি.ডি.)*'।

কারখানায় নিযুক্ত শিশুশ্রমিক ছাড়াও দিল্লিতে রয়েছে বিপুল সংখ্যক স্বনিয়োজিত পথশিশু। *ইন্সটিট্যুট অফ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ও সেভ দ্য চিলড্রেন*-এর যৌথ সমীক্ষায় (২০১১) জানা গেছে দিল্লির পথে প্রতিদিন প্রায় ৫১ হাজার অবহেলিত ও অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে থাকে। এরা সকলেই যে পথবাসী তা নয়; খিদে, অভাব আর পরিবারের সবাই কাজে বেরিয়ে যাওয়ার কারণে দিনের বেলা এরকম ৭০% শিশু পথে ঘোরে। অনেকে হারিয়েও যায়। অসরকারি সংস্থা *নবসৃষ্টি* তথ্যাধিকার আইনে দিল্লি পুলিশের থেকে জানতে পারে কেবল ২০১২-র প্রথমার্ধেই ১০০০-এরও বেশি শিশু হারিয়ে গেছে এবং এদের বেশিরভাগই বস্তি কলোনিগুলির দরিদ্র পরিবারের সন্তান। আর যারা হারায় না তাদের ২০% কুড়ানি, ১৬% ফেরিওয়ালা, ১৫% ভিখারি, ১২% পথের ধারে স্টলে বা সারাইয়ের দোকানে কাজ করে। বাকিরা যখন যা পায় তাই করে। নিজেদের খাবারটুকু এদের জোগাড় করতেই হয়, সেইসাথে শৌচাগারের পয়সা। স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায়নি বা নীচু ক্লাসেই স্কুলছুট হয়েছে প্রায় অর্ধেক শিশু। ফলে এরা সহজেই খারাপ সংসর্গে পড়ে এবং নানাবিধ নিগ্রহের শিকার হয় (সূত্র: *অ্যাকশন প্ল্যান ফর অ্যাবলিশন অফ চাইল্ড লেবার ইন দিল্লি* ২০১০; *স্ট্যাটাস অফ চিল্ড্রেন ইন আর্বান ইন্ডিয়া-বেসলাইন স্টাডি* ২০১৬)।

জাহাঙ্গীরপুরী বস্তির কথাই ধরা যাক। বস্তিবাসীদের বেশিরভাগই ময়লা কুড়ানি, জোগাড়ে, রিকশাচালক, হকার বা গৃহপরিচারিকা। ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে থাকা ছোটো ছোটো ঘরের জটলা, খোলা নর্দমা আর সরু গলিপথের মধ্যে সারাদিন ঘুরছে, খেলছে, অরক্ষিত, নজরহীন ধূলিমলিন শিশুরা। সদ্য হাঁটতে শেখা শিশুকে নর্দমার ধার থেকে তুলে আনছে তার থেকে ৫-১০ বছরের বড়ো দিদি। মা-বাবার কথা জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'কাজে গেছে'। এরকমই একদিন পথ থেকে হারিয়ে গেল দশ বছরের বিজয়, গৃহপরিচারিকা সুমিতা হালদারের যমজ সন্তানের একটি, যার সন্ধান আর পাওয়া যায়নি। হারিয়ে যায় পাঁচ বছরের একটি মেয়ে শিশুও। সংবাদে প্রকাশ, পুলিশ অনুসন্ধান করেনি, চারদিন পর প্রতিবেশীরা খুঁজে পায় তার ধর্ষিত শরীর (*ফার্স্টপোস্ট*, ২৬.০৪.২০১৩)।

সুস্থ, সবল, আনন্দময় শিশুদের উপস্থিতিই কেবল একটি নগরের অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যকে উন্মোচিত করে। কিন্তু বিশাল সংখ্যক শিশুশ্রমিকের অস্তিত্ব দিল্লির ক্ষেত্রে এমন ভাবমূর্তির বিরুদ্ধেই যায়। মনে রাখতে হবে, ন্যূনতম সঙ্গতি থাকলে কোনো পরিবার থেকে শুধু দু-বেলা দু-টি খেতে পাওয়ার জন্য এভাবে শিশুশ্রমিক আসতে পারে না। জ্বালানির মতো শিশুশ্রমের এই জোগান আসতে থাকে দিল্লির ঝুগ্‌গি-ঝোপড়ি বা বস্তিবাসী হতদরিদ্র পরিবারগুলি থেকে। এখনও দিল্লিবাসীর ৯.৯% অর্থাৎ প্রায় ১৭ লক্ষ মানুষ রয়েছেন দারিদ্রসীমার নীচে (বি.পি.এল.)। অথচ দেশের সব ক-টি নগরের মধ্যে দিল্লিবাসীর মাথাপিছু গড় আয় সবচেয়ে বেশি, অবশিষ্ট ভারতের প্রায় ৩ গুণ, যা বছরে ৩ লক্ষ টাকারও উপরে (*দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, ১৬.৫.২০১৭)। কেবল আর্থিক অবস্থা নয়, জনঘনত্বের দিক থেকেও সামগ্রিকভাবে দিল্লিবাসী ও বস্তিবাসীদের মধ্যে ব্যবধান বিশাল। ২০০৯-এ দিল্লির কোনো বস্তি এলাকার জনঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গ কি.মি.-এ গড়ে প্রায় ৩ লক্ষ (প্রতিমা সিং ২০০৯, *সেন্টার ফর সিভিল সোসাইটি ওয়ার্কিং পেপার ২৩০*)। যেখানে ২০১১-তে (*গভঃ অফ জি.এন.সি.টি.ডি.*) অধীন এলাকার জনঘনত্ব প্রায় ১১ হাজার জন। ঝুগ্‌গি-ঝোপড়ি বা বস্তিগুলির দরিদ্রতম অধিবাসীদের জীবনের মান সুস্থায়ীভাবে উন্নত না হলে এই বিপুল বৈষম্য দূর হতে পারে না।

(২)

দিল্লি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট (*ডি.এইচ.ডি.আর*) ২০১৩ অনুযায়ী দিল্লিবাসীদের মধ্যে ৪৫ শতাংশই বস্তিবাসী। ইতিপূর্বে অবশ্য উচ্চ আদালতে পেশ করা একটি সরকারি হলফনামায় প্রায় অর্ধেক (৪৯%) দিল্লিবাসীকেই ঝুগ্‌গি-ঝোপড়ি বা বস্তির বাসিন্দা বলে জানানো হয়েছে (*দি টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়া*, ০৪.১০.২০১২)। যদিও সেনসাস ২০১১ অনুযায়ী দিল্লিতে ১১% বস্তিবাসী রয়েছেন। অনুপাতের এই তারতম্যের মূল কারণ সেনসাস নির্ধারিত বস্তির সংজ্ঞা (সেনসাস সংজ্ঞার সমস্যা নিয়ে *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*, জুন-জুলাই ২০১৭ সংখ্যার ৫৬ পৃষ্ঠায় আলোচনা রয়েছে)। লক্ষণীয় হল, মুম্বাইয়ের 'ধারাভি'-র মতো রাজধানী দিল্লিতে কোনো একক বড়ো বস্তি নেই। বিপরীতে দিল্লিতে বস্তিগুলি ছড়িয়ে আছে নানা রূপে, নগরের পরতে পরতে। যথা— চিহ্নিত (*ডেজিগনেটেড*) বস্তি এলাকা, অননুমোদিত (*আনঅথরাইজড*) কলোনি, ঝুগ্‌গি-ঝোপড়ি গুচ্ছ বা ক্লাস্টার (*জে.জে.সি.*), স্থানান্তরিত/ বিস্থাপিত (*রিলোকেটেড/রিসেটলড*) কলোনি (*রি-জে.জে.সি.*), নিয়মভুক্ত (*রেগুলারাইজড*) কলোনি, ইত্যাদি।

রাজ্য সরকারের সংস্থা *দিল্লি আর্বান শেল্টার ইমপ্রুভমেন্ট বোর্ড* (*ডি.ইউ.এস.আই.বি*) ২০১৪-র তথ্যে প্রকাশ, দিল্লির বিভিন্ন অঞ্চলে ৮.৮৫ বর্গ কি.মি. জমিতে এমন মোট ৬৭২টি 'জে.জে.সি.'-র ৩,০৪,১৮৮টি ঝুগ্‌গিতে ১০% দিল্লিবাসী থাকেন, যাঁদের ৮৫%ই বি.পি.এল। যেমন, জাহাঙ্গীরপুরী, ওয়াজিরপুর, বদরপুর, গোল মার্কেট ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকার জে.জে.সি. বা রি.জে.জে.সি.। *দিল্লি স্লাম অ্যাক্ট*-এর ভিত্তিতে পুরানো দিল্লির চিহ্নিত-বস্তি এলাকায় ১ লক্ষ কাটরাতে রয়েছেন ১০ লক্ষ পরিবার। *জি.এন.সি.টি.ডি.*-কৃত ১৯১৩-র তথ্যানুযায়ী ১৬৩৯টি অননুমোদিত কলোনিতে ৪০ লক্ষ ও ৪৪টি রি.জে.জে. কলোনিতে ১২.৫ লক্ষ মানুষ বাস করতেন। দিল্লি ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৬-এ নিয়মভুক্ত কলোনিতে বাস করতেন প্রায় ২১ লক্ষ অধিবাসী। আর এসবের বাইরে রয়েছেন প্রায় ১ লক্ষ ফুটপাথবাসী। এজন্য অল্প কয়েকটি নৈশাবাস থাকলেও তা সবই পুরুষদের জন্য।

রোজগার ও লেখাপড়ার জন্য বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রতিবছর দিল্লিতে থাকতে আসেন প্রায় ৭৮ হাজার মানুষ (*ডি.এইচ.ডি.আর ২০১৩*)। রুজির সন্ধানে আসা দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ বসবাসের জন্য বেছে নেন রেললাইনের ধার, নদী বা খাল পাড় বা অন্য খালি জমি, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরকারি জায়গা। পছন্দের মাপকাঠি হল, কাছাকাছি যেন থাকে কাজের জায়গা, জলের উৎস, আর শৌচের সুবিধা। সেখানে তাঁরা সকলে মিলে কাদা-মাটি, বালি, বাতিল কুড়িয়ে আনা বা সামান্য পয়সায় কেনা জিনিসপত্র, যেমন ভাঙা টিন, প্লাই, পলিথিন ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করেন অস্থায়ী ঝুগ্‌গি-ঝোপড়ি। অননুমোদিত কলোনিগুলিতে আবার বেসরকারি জমি প্লট করে সরু গলির মধ্যে ঘিঞ্জিভাবে কাঁচা (মাটির)

চিত্র ১. জলের জন্য লড়াই
Source: Daniel Berehulak/Getty Images
Anuj Dewan/July 28, 2016/YOUTH KI AWAAZ

বা আধ-পাকা (ইঁট-মাটির) অবৈধ ঘর তুলে ভাড়া দেওয়া হয়। এই ঘরগুলি ঝুগ্‌গি-ঝোপড়ির তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ও আংশিক বৈধ। উভয়ক্ষেত্রেই ঘর অতি সংকীর্ণ, আনুমানিক ৬ × ৮ ফুট। দরজা ভাঙা, জানালার বালাই নেই। আলাদা রান্নাঘর বা শৌচাগার থাকে না। কাপড় কাচতে হয় ঘরের ধাপিতে। ঘর প্রতি থাকেন ৫-৭ জন মানুষ। এলাকায় গড়ে ২৭ জন পিছু রয়েছে ১টি শৌচালয় এবং প্রায় ১০০০ জনের জন্য একটি মাত্র অনিয়মিত জলের উৎস (প্রতিমা সিং, ২০০৯)।

দিল্লির বস্তিগুলিতে নিজস্ব রান্নার ব্যবস্থা না থাকা, কলের পরিশ্রুত জল না পাওয়া, শৌচালয় না থাকা ইত্যাদি অপ্রতুল পরিকাঠামোর সাথে 'রোগ-বিদ্যমানতা'-র (*মর্বিডিটি প্রিভ্যালেন্স*) সুস্পষ্ট পরিসংখ্যানসম্মত সম্পর্ক পেয়েছেন পি. মরিমুথু প্রমুখ গবেষকরা (*ইন্ডিয়ান জা. কম্যুনিটি মেডিসিন ২০০৯*)। যেমন, '*হোপ প্রজেক্ট*' সমীক্ষায় জানা গেছে, নিজামুদ্দীন বস্তিতে শিশুদের স্থায়ী চর্মরোগ, শ্বাসযন্ত্রের অসুখ, গ্যাসট্রাইটিস, কৃমি, রক্তাল্পতা ও ঘন ঘন ডায়রিয়ার সুনির্দিষ্ট কারণ তাদের বায়ু চলাচলের ব্যবস্থাহীন স্যাঁতসেতে ঘরে ঠাসাঠাসি বাস, শৌচালয়ের অভাব ও নিরাপদ জলের অপ্রতুলতা (সুদেষ্ণা চ্যাটার্জী, *আর্লি চাইল্ডহুড ম্যাটার্স, জুন ২০১২*)।

(৩)

দিল্লিতে বস্তিবাসীরা জল পেয়ে থাকেন দু-ভাবে; জলের পাইপ বা তার অভাবে ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে। সরবরাহের দায়িত্বে রাজ্য সরকারের প্রতিষ্ঠান দিল্লি জল বোর্ড। ট্যাঙ্কারে জল দেওয়ার কথা প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে, কিন্তু আসে মর্জিমতো, দু-এক দিন অন্তর। বস্তিবাসীরা অবশ্য এর মধ্যে অশুভ আঁতাতের ছায়া দেখেন। কারণ সেই শুখা দিনগুলিতে জল আনে বেসরকারি সরবরাহকারীরা। উদাহরণ; 'বসন্ত কুঞ্জ'-র কাছে 'দলিত একতা ক্যাম্প'। বস্তিতে যখনই ট্যাঙ্কার আসে, জনতার ভিড় ও ধস্তাধস্তি শুরু হয়, তারই মাঝে কোনো চটপটে কিশোর ট্যাঙ্কারে উঠে পাইপ দিয়ে কলসি বালতি ভরতে শুরু করে। পিছলে পড়ে মারাত্মক আহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। যেসব বস্তিতে জলের পাইপ রয়েছে সেখানে জল আসে মাঝে মধ্যে এবং তার মান এতই খারাপ যে কর্তৃপক্ষ জল ধরে রেখে ফুটিয়ে খাওয়ার পরামর্শ দেন, যা বাসিন্দাদের আর্থিক ক্ষমতার বাইরে। উদাহরণ; দক্ষিণ দিল্লির 'বসন্ত বিহার' এলাকার বস্তি।

এমত অবস্থায় ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি জলবাহিত রোগ এসব এলাকায় নিত্যসঙ্গী। উপরন্তু অপ্রতুল জল সরবরাহের কারণে শৌচালয়গুলি অব্যবহার্য হয়ে গেলে মানুষ বাধ্য হয়ে উন্মুক্ত স্থানে যায় এবং জলবাহিত রোগের সম্ভাবনা বাড়ে। আর জলের বিকল্প উৎস যমুনা নদী তো দিল্লির ৮০% দূষণ বহন করছে (অনুজ দেওয়ান ২৮.০৭.২০১৭, *এনভায়রনমেন্ট*)। সর্বোপরি জল বণ্টনেও রয়েছে বৈষম্য। প্রসঙ্গত ২০০৭-৮ থেকে ২০১২-১৩-র মধ্যে ঝুগ্‌গি-ঝোপড়িতে জল বাজেট ১০.৮ কোটি থেকে ৫ কোটিতে নামিয়ে দেওয়া হয় (জ্ঞানরঞ্জন পাণ্ডা ও তৃষা আগরওয়াল ২ ফেব্রু ২০১৩, *ই.পি.ডব্লিউ.*)। মেহরৌলি ও নরেলার মতো বস্তি এলাকায় যেখানে দিনে মাথাপিছু ২৯ লিটার জল বরাদ্দ, সেখানে করোলবাগ বা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সরবরাহ হয় যথাক্রমে ৩৩৭ ও ৫০০ লিটার। (এ. হায়দার ২০১৬, *ওয়াটার ইন্টিগ্রিটি নেটওয়ার্ক*)।

২০১২-তে দিল্লি সরকারের সমীক্ষায় প্রকাশ, প্রায় ৩০% বস্তিবাসীর কোনোরকম শৌচালয় ব্যবহারের সুযোগই নেই এবং প্রায় অর্ধেক বস্তিবাসী উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ করে। সমগ্র রাজধানীতে এরকম ২৫৪-টি স্থান চিহ্নিত হয়েছে। দিল্লিতে বস্তি এলাকার বাসস্থানের উন্নতি ও শৌচালয়ের দায়িত্বে রয়েছে *ডি.ইউ.এস.আই.বি.* । অবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এরা ২০১৭-র নভেম্বরের মধ্যে ১৯,১৬৮টি পায়খানা সমন্বিত ৬৪১টি গণশৌচালয় তৈরি করে। যদিও দেখা গেছে, বস্তিবাসীদের মাত্র ২০-২৫% গণশৌচালয়গুলি ব্যবহার করে থাকেন (আশিস মিশ্র ১১.১২.১৭, *হিন্দুস্থান টাইমস*)। গণশৌচালয়গুলি পূর্ণমাত্রায় ব্যবহারে বস্তিবাসীদের দিক থেকেও বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। গবেষক অভিষেক অঙ্গদ ৮টি বস্তি সমীক্ষা করে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি চিহ্নিত করেছেন (*দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, ১৩.০৩.২০১৭)—

১. দূরত্ব—যমুনার অববাহিকায় দিল্লি-নয়ডা উড়ালপথ ও অক্ষরধামের মধ্যে আছে ১৫০০ ঝুগ্‌গি আর ১০টি শৌচাগার। কিছু ক্ষেত্রে ঝুগ্‌গি ও শৌচাগারের দূরত্ব ২ কি.মি. পর্যন্ত রয়েছে।

২. দীর্ঘ অপেক্ষা—লম্বা লাইন হলে কাজে বা স্কুলে যেতে দেরি হয়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বা শিশুরা এতটা সময় নিজেদের ধরে রাখতে পারেন না। উদাহরণ—রোহিণীর বদলি পল্লি ও মডেল টাউনের সিগারেটওয়ালাবাগের ১০০০টি ঝুগ্‌গি।

৩. অর্থাভাব—একবার পায়খানা ব্যবহারের খরচ এক টাকা। ভিড়ে রক্ষীরা দু-টাকাও দাবি করে। শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ঋতুকালীন মহিলা ও পেটের রোগীকে দিনে একাধিকবার শৌচালয় যেতে হয়। পরিবারের ৬-৭ জন দিনে ২-৩ বার ব্যবহার করলে মাসিক খরচ পড়ে প্রায় ১০০০ টাকা, যা অনেকেই দিতে পারেন না। উদাহরণ, কালকাজি ভূমিহীন ক্যাম্প বা শাহবাদ দৌলতপুরের মোট ৪৫০০ ঝুগ্‌গি।

৪. জল ও আলোর অভাব, অপরিষ্কার শৌচালয়—এমন অভিযোগ পশ্চিম দিল্লির গোল্ডেন পার্ক এলাকার বস্তিবাসীদের। বিপরীতে ভূমিহীন ক্যাম্প এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের অভিযোগ, ব্যবহারকারীরা নোংরা করে, কল ভেঙে রাখে, ইত্যাদি। মডেল টাউনের হনুমান মন্দির এলাকার ১০০টি ঝুগ্‌গির নিকটবর্তী শৌচালয় পরিষ্কার রাখতে বেশি সময় বন্ধ রাখা হয়।

৫. যৌন হেনস্থা—বস্তি নির্বিশেষে মেয়েদের পক্ষে রাতে শৌচালয় যাওয়া বিপজ্জনক। ২০১৬-তে যমুনা অববাহিকায় একটি ১৬ বছরের কিশোরী এই হেনস্থা রুখতে গিয়ে ছুরিকাহত হয়। ২০১৭-তে রোহিণীর দুই বস্তি-বালিকা শৌচালয়ের জন্য বেরিয়ে ধর্ষিতা হয়।

এই পরিস্থিতির পরিণতি উন্মুক্ত জমি বা খোলা নর্দমায় মলত্যাগ। দক্ষিণ পশ্চিম দিল্লির পূর্ব কিদোয়াইনগর বস্তিবাসীরা শৌচাগার যাওয়ার সমস্যা থেকে বাঁচতে প্রত্যেকটি ঝুগ্‌গিরই সামনের নালার

ওপর একটি করে মাচা ও আড়াল দিয়ে সাময়িক পায়খানা বানানো হয়েছে যেখান থেকে মল সরাসরি নালায় পড়ে। নালাটি বদ্ধ, পূতিগন্ধময় ও রোগজীবাণুর আঁতুড়। ২০১৬-তে খিচড়িপুর, বিসমিল ক্যাম্প ও অন্যান্য একাধিক জে.জে. কলোনিতে চিকুনগুনিয়া ছড়িয়ে পড়ে, যার একমাত্র উৎস ছিল রুদ্ধ ও উন্মুক্ত নালা। ২০১৬-১৭-তে অধ্যাপক বেনস্টন জন (অর্থনীতি বিভাগ, সেন্ট স্টিফেন কলেজ) তাঁর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে উত্তর পূর্ব দিল্লির জাফরাবাদ ও জনতা কলোনি এবং উত্তর-পশ্চিম দিল্লির মঙ্গলপুরী বস্তিতে সমীক্ষা করে দেখেছেন খোলা নর্দমাযুক্ত এলাকার সাথে ডায়ারিয়া প্রাদুর্ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ডায়ারিয়া বা অনুরূপ ধারাবাহিক সংক্রমণ যে কেবল সেই সময়ের জন্য পীড়িত করে তাই নয়, শিশুদের ক্ষেত্রে তা পরবর্তীকালে পুষ্টি ও বৃদ্ধিও ব্যাহত করে।

চাইল্ড রাইট অ্যান্ড ইউ (*ক্রাই*) ২০১৫-তে সমীক্ষায় দেখেছে দিল্লির বস্তিসমূহের ৬ বছরের কমবয়সি শিশুর ৫০%-এর ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় কম এবং ৪৫%-এর বৃদ্ধি ব্যাহত রয়েছে (*দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* ০৪.১১.২০১৫)। শিশু অপুষ্টি মোকাবিলায় *ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস* (*আই.সি.ডি.এস.*)-এর অধীন 'অঙ্গনওয়ারি' কেন্দ্রগুলির প্রাথমিক দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু বাজেট সংকোচনে 'অঙ্গনওয়ারি' কেন্দ্রগুলি ধুঁকছে। যেমন, পূর্ব দিল্লির নয়ি সীমাপুরি বস্তিতে রয়েছে ১২টি কেন্দ্র। এরকম একটি কেন্দ্রে বরাদ্দকৃত ৭৫০ টাকা ভাড়ায় ১০০ বর্গফুটের প্রায়ান্ধকার ঘরে ২০টি শিশুকে দেখভাল করার জন্য রয়েছেন মাত্র একজন কর্মী। 'অঙ্গনওয়ারি' অসফল হওয়ায় হাসপাতালগুলির পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্রর ওপর চাপ বাড়ে। তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের জন্য দিল্লিতে এরকম ১১-টি কেন্দ্র আছে, কিন্তু তার অধিকাংশই বন্ধ থাকে। গরমকালে বস্তি এলাকাগুলিতে ডায়ারিয়ার প্রাদুর্ভাব বাড়লে এই কেন্দ্রগুলিতে চাপ চতুর্গুণ হয়ে যায়। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশিকা মোতাবেক পরিকাঠামো একটি কেন্দ্রেও নেই। যেখানে ১৯৫০ বর্গফুট ঘরে ১০টি শয্যা, শিশুদের খেলার জায়গা, নার্সিং স্টেশন, রান্না ও ভাঁড়ারের ব্যবস্থা, দু-টি বাথরুম ও শৌচাগার থাকার কথা সেখানে একটি চালু কেন্দ্রে ২০০ বর্গফুট ঘরে ৩-৪টি শয্যায় ৫ থেকে ২০টি পর্যন্ত শিশুকে রাখা হয়। সবচেয়ে বড়ো কথা এই শিশুদের জন্য আলাদা খাবারেরও ব্যবস্থা হয় না। (শ্রিয়া মোহন, *ফেলো, ন্যাশানাল ফাউণ্ডেশন ফর ইন্ডিয়া,* ০৪.০৬.২০১৫, *স্ক্রোল.ইন*)।

(৪)

অপ্রতুল পুর-পরিকাঠামো ছাড়াও দিল্লির বস্তিবাসীদের স্বাস্থ্যহানির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস পেশাগত ব্যাধি। আর এই ব্যাধিতে সবচেয়ে আক্রান্ত হয় শিশুশ্রমিকরা। দিল্লির উল্লেখযোগ্য উৎপাদন-শিল্প, পোশাকের কথাই ধরা যাক। রপ্তানিযোগ্য পোশাক উৎপাদনই দিল্লির বৈশিষ্ট্য। জাতীয় পোশাক উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ আসে দিল্লি থেকে এবং ভারতবর্ষের রপ্তানিযোগ্য পোশাকের ৬০% উৎপাদন করে দিল্লি। ৮,০০০-এরও বেশি শিশু এই পোশাক শিল্পে কর্মরত। এদের অধিকাংশেরই পরিবার অথবা এরা নিজেরাই কারও মাধ্যমে অভিবাসিত হয়ে দিল্লি এসেছে প্রধানত উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ, এই চার রাজ্য থেকে। এই শিশুশ্রমিকদের ৩৫%-এরই বয়স ৫-১৪ বছর। পোশাক কারখানাগুলি শিশুশ্রম আইন এড়াতে বোতাম বসানো, সূচিশিল্প, জরি-চুমকির কাজ ও কাচ বসানো, সুতো কাটা, ইত্যাদি হাতের কাজ বাইরে থেকে করিয়ে নেয় (আউটসোর্সিং)।

বস্তি এলাকার দুঃস্থ পরিবারগুলির ছেলেমেয়েরা সবাই মিলে ঘরে বসে এই কাজ তোলে। পোশাক শিল্পের ৮৭% শিশুশ্রমিক কাজ করে ঘরেতেই। আর যেসব ছেলেমেয়ে দিল্লিতে একা আসে তাদের ঠাঁই হয় পোশাক সেলাইয়ের 'আড্ডা'-য়, যেখানে তারা একসাথে থাকে, খায় এবং কাজ করে। উদ্ধারকারী ও পুলিশের চোখ এড়াতে 'আড্ডা' মালিকরা জানালা বন্ধ রেখে 'শাটার' টেনে আলো জ্বেলে দিবারাত্র কাজ করায়। ঘরে বা 'আড্ডা'-য়, একটানা বদ্ধ ঘরের মেঝেতে ঘেঁষাঘেঁষি বসে কম আলোয় ঘাড় গুঁজে কাজ করার ফলে এদের প্রত্যেকে পিঠে ব্যথা ও অর্ধেক দৃষ্টিক্ষীণতায় ভোগে। 'আড্ডা'-গুলিতে একটানা মেশিনের শব্দে কারও কারও শ্রবণশক্তির সমস্যাও দেখা দেয়। এছাড়া ধারালো যন্ত্র থেকে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে প্রায়ই। ঝুঁকি সত্ত্বেও, কী ঘরে কী বাইরে, ৯০% শিশুশ্রমিকের স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার কোনো সুযোগই নেই। (*দি হিডেন ওয়ার্কফোর্স,* ২০১৫, *সেভ দি চিলড্রেন*)।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের সবচেয়ে ব্যাধিপ্রবণ পেশা হল আবর্জনা থেকে বাতিল জিনিস সংগ্রহ অর্থাৎ 'কুড়ানি'-র কাজ। এই কাজে শিশুসহ দিল্লির বস্তিবাসীদের একটি বড়ো অংশ স্বনিযুক্ত থাকে, যাঁদের সংখ্যা আনুমানিক ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ। দিল্লিতে প্রতিদিন ৭৪০০ টন জঞ্জাল উৎপন্ন হয় এবং এই কুড়ানিরা প্রতিদিন ১২০০-১৫০০ টন আবর্জনা পুনরুদ্ধার ও নবীকরণ করে (*টাইমস অফ ইন্ডিয়া,* ০৪.১০.২০১৪)। এর ফলে পুরসভাগুলির দৈনিক প্রায় এক কোটি টাকা বাঁচে (শিবানী সিং, *হিন্দুস্থান টাইমস,* ১২ মার্চ ২০১৮)। দিল্লিতে জঞ্জাল ফেলার প্রধান তিনটি জমি রয়েছে ভলসয়া, গাজীপুর ও ওখলাতে। এগুলির কাছের বস্তি থেকে প্রতিদিন সকালে কোনোরকম সুরক্ষা ছাড়াই জঞ্জাল থেকে বাতিল জিনিস সংগ্রহ করতে চলে আসে শিশু ও বয়স্করা। প্লাস্টিক ও ইলেকট্রনিক বর্জ্য বাছাই করতে গিয়ে তারা 'পিইটি', 'পিভিসি', সিসা, পারদ, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি বিষাক্ত বস্তুর সংস্পর্শে আসে। অথচ সারাদিন পরিশ্রম করে, প্রায় ৫০ হাজার টন জঞ্জাল উদ্ধার করেও তারা মাসে ১০০০ টাকার বেশি উপার্জন করতে পারে না।

উদাহরণ হিসেবে, ভলসয়া 'জঞ্জাল জমি'র কথাই ধরা যাক।

'আউটার রিং রোড'এর উত্তরে এই ১৬ হেক্টর জমিতে প্রতিদিন প্রায় ২২০০ টন জঞ্জাল পড়ে। প্রায় ২২ মি. উঁচু এই জঞ্জালস্তূপের পাশে রয়েছে ভলসয়ার ঝুগ্‌গি-ঝোপড়িগুলি (রি.জে.জে.)। নিচু জমিতে স্তূপের দূষিত জল জমে কলুষিত হয় এলাকার জল। ফলে এলাকায় জন্ডিস ও অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় (শ্রিয়া মোহন ০৩.০৬.২০১৫)। ভলসয়ার দক্ষিণে অনতিদূরে জাহাঙ্গীরপুরি বস্তি। ভলসয়া বস্তির প্রায় সবাই এবং জাহাঙ্গীরপুরি বস্তির প্রায় ২০% বাসিন্দা আবর্জনা সংগ্রহের কাজে স্বনিযুক্ত। রোগজীবাণুর আড়ত, গ্যাস ও দুর্গন্ধযুক্ত এই জঞ্জালস্তূপে কাজ করতে গিয়ে হাঁপানি, চর্মরোগ, কুকুরের কামড়, ধারালো জিনিসে হাত-পা কেটে যাওয়া, ইত্যাদি এই পেশার নিত্য সমস্যা। আর এর থেকে হতে পারে নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, জলাতঙ্ক, ধনুষ্টঙ্কার, এমনকী এইডসও।

চিত্র ২. জঞ্জাল কুড়ানি শিশুদের একটি দল
(asha-india.org/gallery/slum-condition)

জঞ্জাল জমির সংগ্রাহক ছাড়াও রয়েছে 'পথ-কুড়ানি'-দের দল, যারা অধিকাংশই অপ্রাপ্তবয়স্ক। দিল্লির 'পথ-কুড়ানি' বালিকাদের ওপর একটি সমীক্ষায় (প্রীতি সোনি ২০১৪, *জা. অ্যালকোহলিজম অ্যান্ড ড্রাগ ডিপেন্ডেন্স, ২:৪*) দেখা যায়, এদের ৯৭%ই থাকে বস্তিতে পরিবারেরই সঙ্গে, কিন্তু প্রত্যাশিত আয়ের থেকে কম রোজগার হলে জোটে মার। ৮৭%-এর বাবা মদ বা ড্রাগে আসক্ত। এই মেয়েদের ৯৫% ঘরে বা বাইরে কোনো না কোনো নিগ্রহের শিকার। সারা দিনে ১০-১২ ঘণ্টা ঘুরে এবং ১০-১৫ কি.মি. হেঁটে এরা মাত্র ৬০-৭০ টাকা আয় করতে পারে। নানা সময়ে পথ দুর্ঘটনায় পড়েছে ৭৫% কুড়ানি বালিকা। এদের ৭১% দিনে একবারের বেশি খেতে পায় না এবং ১০% বাধ্য হয়েছে দেহ বিক্রি করতে। প্রায় প্রত্যেকেই শরীরে ব্যথা-যন্ত্রণা, ধারালো জিনিসের আঘাতে ক্ষত, চর্মরোগ, নানাবিধ সংক্রমণ ও দুর্বলতার শিকার। এইসব 'কুড়ানি'-দের জন্য নেই কোনো স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বা পরিষেবা ব্যবস্থা, যদিও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মতে যে অবস্থার মধ্যে এঁদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয় তা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল (শিবানী সিং, ২০১৮)।

(৫)

সামগ্রিকভাবে দিল্লির বস্তি এলাকায় স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রসারে এবং পরিষেবা প্রদানে ধারাবাহিক অবহেলা ও বৈষম্য লক্ষ করা যায়। ১৯৯৭-তে দিল্লি সরকার বস্তি এলাকার জন্য 'প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রম' চালু করে। যদিও তার দশ বছর পরেও আগরওয়াল, পাণ্ডে ও ভট্টাচার্য (*ইন্ডিয়ান জা. মেডিকেল সায়েন্স, সেপ্ট.* ২০০৭) তাঁদের বস্তি সমীক্ষায় দেখেছেন, প্রাক-প্রসবকালীন পরিচর্যার অভাবে রক্তাল্পতার কারণে এবং অপ্রশিক্ষিত ধাই-এর হাতে প্রসবের ফলে 'প্লাসেন্টা' পরিষ্কার না হওয়াও অত্যধিক রক্তক্ষরণে যথাক্রমে ১২%, ৪২% ও ১৩% ক্ষেত্রে প্রসবকালে মায়ের মৃত্যু হয়েছে। সমগ্র দিল্লিতে শিশুমৃত্যুর হার যেখানে প্রতি হাজারে ৪০ সেখানে বস্তি এলাকায় এই হার হাজারে ৫৪ (*দি হিন্দু* ১৭.১২.২০০৯)। বস্তির মহিলাদের মধ্যে একটি নমুনা সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৮ বছরের নীচে বিয়ে হয়ে গেছে ৪৯.৮% মেয়ের, ৩৮.৮% বিবাহিতা কোনো গর্ভনিরোধক ব্যবহারের সুবিধা পায়নি, ফলে বিপজ্জনক গর্ভপাতে ১৩.২% প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে (ছাবরা ও ভরদ্বাজ ২০১৩, *জা. কম্যুনিটি নিউট্রিশন অ্যান্ড হেলথ*)।

সঙ্গীতা ও বির (*ন্যাশনাল ইন্সটিট্যুট অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার*) ২০১২-তে লক্ষ করেছেন, দিল্লিতে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছ থেকে প্রসবোত্তর পরিচর্যা পেয়ে থাকেন মাত্র ৫১% বস্তিবাসী নতুন মা। গর্ভাবস্থায় উপযুক্ত পর্যবেক্ষণের অভাবে জন্মায় কম ওজনের শিশু (শ্রিয়া মোহন ০৩.০৬.২০১৫)। *সেভ দি চিল্ড্রেন*-এর ২০১৫-র প্রতিবেদনে জানা যায়, দিল্লির বস্তিবাসী প্রসূতির মাত্র ২৭% প্রাক-প্রসব পর্যায়ে ডাক্তার দেখাতে পেরেছেন এবং ১৯% প্রসবকালে প্রশিক্ষিত সেবিকার সহায়তা পেয়েছেন। মাত্র ৫৬% শিশু পেয়েছে হামের টিকা। যদিও রাজধানীর উচ্চকোটি বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে এই হার যথাক্রমে ৯৩%, ৯৯% ও ৯৮%। এইসব ছবির একটাই অর্থ, সরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা বস্তিবাসীদের কাছে ঠিকমতো পৌঁছায় না।

সেক্টর ৭-এর বস্তির কথাই ধরা যাক। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে কাছেই; কিন্তু রোগ জটিল হলে যেতে হয় দূরে, গাড়িভাড়া করে। সরকারি হাসপাতালে বিনা খরচে চিকিৎসা পেতে লাগে আইডেন্টিটি কার্ড। অননুমোদিত বস্তিবাসী বা অস্থায়ী ঝুগ্‌গি-ঝোপড়ির বাসিন্দারা অধিকাংশই অভিবাসিত। বি.পি.এল. কার্ডটি পরিবারের অন্য সকলের জন্যও, ফলে সেটি তাঁরা গ্রামেই রেখে আসেন। যাঁরা স্থানীয় মানুষ তাঁরাও সহজে কার্ড জোগাড় করতে পারেন না। মাত্র ৪০%-এর আছে বি.পি.এল. কার্ড (ব্যানার্জী ও অন্যান্য ২০১২, *ইন্ট্যারন্যাশনাল গ্রোথ সেন্টার*)। বেসরকারি চিকিৎসার খরচ তো নাগালের বাইরেই থেকে যায়। দু-বেলা খাবার জোগাড় করতে বস্তিবাসীদের খরচ হয় রোজগারের ৭৫%। জল, জ্বালানি, শৌচালয়-এর সাথে ডাক্তার-ওষুধ

যোগ করলে খরচ করতে হয় আরও ৪০%। অতএব এই বাড়তি ১৫% বাঁচাতে বেশিরভাগ বস্তিবাসী ছোটেন পাশ না করা 'কোয়াক'-দের কাছে, সাহায্য নেন অপ্রশিক্ষিত আয়া বা ধাইদের (মাইকেল রেগনিয়ের, প্রতিবেদক: *মোজাইক নিউজলেটার,* ৩০.০৯.২০১৪)।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, রোগ জটিল বা সাধারণ যাই হোক, মোটামুটি ৬০% রোগী সরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রে যান। সরকারি হাসপাতাল সম্পর্কে ওই সমীক্ষায় অংশ নেওয়া বস্তিবাসীদের অভিজ্ঞতা—বেশি সময় লাগে (৫১%), কর্মীরা ব্যস্ত (২৬%), ওষুধ নেই (২০%) এবং খারাপ ব্যবহার (১৬%)। (ব্যানার্জি, পাণ্ডে ও ওয়ালটন, অক্টো ২০১২, *ইন্টারন্যাশনাল গ্রোথ সেন্টার*)। বিশ্ব ব্যাঙ্কের অর্থনীতিবিদ জিষ্ণু দাস ও জেফ হ্যামার (২০০৭) সমীক্ষায় দেখেছেন দিল্লির বস্তি এলাকায় চিকিৎসারত ডাক্তারদের মাত্র ৩৪%-এর স্বীকৃত মেডিক্যাল ডিগ্রি রয়েছে। অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ ভি. ব্যানার্জী ও এসথার দুফলো তাঁদের *পুয়োর ইকনমিক্স* (২০১১) বইতে দিল্লির কোনোন বস্তির সন্নিকটে জনৈক 'কোয়াক'-এর কথা বলেছেন যিনি প্রায় সব রোগীকেই ইঞ্জেকশন দিয়ে থাকেন। তাঁর ক্লিনিকের বাইরে একটা জলের ড্রাম থাকে এবং প্রতিটি ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর তিনি বাইরে এসে ওই জলে সিরিঞ্জ-সূঁচ ধুয়ে রাখেন। এমন বিচিত্র পরিচ্ছন্নতাবোধ সত্ত্বেও তাঁর পসার কিন্তু প্রবল।

একবার সেক্টর ৭-এর জনৈক 'কোয়াক' সুরেশ সরকারের সাথে কথা বলেছিলেন রেগনিয়ের (২০১৪)। তাঁর কাছে বেশির ভাগ রোগী সর্দি-কাশি, চর্মরোগ, পেটের গণ্ডগোল ও মূত্রনালির সংক্রমণ নিয়ে আসেন এবং তিনি অ্যালোপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক ওষুধ, ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট এবং ডায়ারিয়াতে স্যালাইন দিয়ে থাকেন। স্থানীয়দের মতে, "হাসপাতাল ও মেডিক্যাল ক্যাম্পগুলি যখন ডায়রিয়া রোগীতে ভর্তি থাকে তখন সেখানে রোগী গেলে ফেলে রাখা হয়। বরং এখানে তো তবু স্যালাইন দেওয়া হয়।" কিন্তু তিনি কীভাবে তাঁর অপরিচ্ছন্ন ক্লিনিকে স্যালাইন দেওয়ার সাহস করেন সেটাই আশ্চর্যের। সমাজ সচেতন না হলে এবং সরকার সচেষ্ট না থাকলে বস্তিবাসীদের পক্ষে বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

(৬)

দিল্লির বস্তিবাসীদের সমস্যাগুলি নিয়ে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন বেশ কিছুকাল। ৩০ বছর আগে, ১৯৮৮-তে, দক্ষিণ দিল্লির আম্বেদকার বস্তিতে ছড়িয়ে পড়া কলেরার চিকিৎসা করতে এসেছিলেন তরুণ স্বেচ্ছাসেবী শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. কিরণ মার্টিন। তিনি দেখলেন বেশিরভাগ অসুখই প্রতিরোধযোগ্য যার মূল উৎস দূষিত জল। এলাকার দীর্ঘ দিনের দাবি ছিল একটি গণশৌচাগার। কয়েক মাস প্রচেষ্টার পর সরকারি উদ্যোগে শৌচাগার ব্লকটি স্থাপনে সমর্থ হলেন ডা. কিরণ। উদ্বোধনে উপস্থিত হলেন নেতা

চিত্র ৩. আশা মহিলা মণ্ডলের সাথে আলোচনারত ডা. কিরণ মার্টিন
(Brochure : Asha – Hope and Transformation in the Slums of Delhi September 2011)

ও আমলারা। বস্তির বাসিন্দারা, বিশেষত মহিলারা দাবি রাখলেন, আগে নেতাদের বস্তির পরিবেশ পরিস্থিতি ঘুরে দেখতে হবে, পরে হবে উদ্বোধন। এভাবে রাজনীতিকরা নাড়া পেতেই বস্তি কমিশনার পরিকাঠামোর উন্নতিতে সচেষ্ট হলেন। ডা. কিরণ বুঝলেন মহিলারা সংঘবদ্ধ হলে, অবহেলিত গরিব মানুষের সক্ষমতা বাড়লে এবং শিক্ষার প্রসার হলে পরিস্থিতির অনেকটাই পরিবর্তন হতে পারে। পাশে পেলেন দেশি-বিদেশি স্বেচ্ছাসেবীদের, কিছু নেতা আমলাকেও। কিন্তু কায়েমি স্বার্থ ক্ষিপ্ত হল। ডা. কিরণকে মারার চেষ্টা হয়েছিল, বাঁচিয়ে দেয় বস্তির মানুষেরাই। অতঃপর গড়ে ওঠে ডা. কিরণের 'আশা ইন্ডিয়া'। কাজ চলে মূলত চারটি ধারায়:

১. বস্তিবাসী মহিলাদের নামে বাসস্থানের স্বত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করা, যাতে উচ্ছেদ ঠেকানো যায় এবং চাকরি ও ঋণ পেতে বাধা না থাকে। উদাহরণ—একতা ও শান্তি বিহার। ২. স্বাস্থ্য কার্যক্রম—কেবল চিকিৎসা বা পরীক্ষানিরীক্ষা নয়, স্থানীয় মহিলা ও ধাইদের প্রশিক্ষিত করে '*কম্যুনিটি হেল্‌থ ভলান্টিয়ার*' রূপে প্রাক-প্রসব পরিচর্যা, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবে উৎসাহদান, শিশুস্বাস্থ্য ও পুষ্টির তত্ত্বাবধান, টিকাকরণ ইত্যাদি দায়িত্ব দেওয়া হয়। ৩. শিক্ষা—শিশু, কিশোর ও তরুণদের লেখাপড়া সুনিশ্চিত করা, স্কুলছুট ও বাল্যবিবাহ আটকানো, স্কুলের পর খেলার সুযোগ বাড়ানো, স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া ও পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা বোঝানো, কম্পিউটার ও ইংরাজি শেখানো, যারা কলেজে পড়তে চায় তাদের সাহায্য, বয়ঃসন্ধির সমস্যা, বাল্যবিবাহের বিপদ ইত্যাদি নিয়ে তরুণদের নিজস্ব বৈঠকের ব্যবস্থা ইত্যাদি। ৪. আর্থিক সহায়তা—ব্যাবসা, বাসা তৈরি বা সারানো, ইত্যাদি প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক ঋণের বন্দোবস্ত করা হয়। সরকারি দপ্তরে তদ্বির-তদারকি ও চাপ সৃষ্টি, মহিলা ও শিশুদের অধিকার ও আইনি সুরক্ষা বোঝানো ইত্যাদির জন্য প্রতিটি 'আশা' বস্তিতে গড়ে তোলা হয় স্থানীয় মহিলা, যুব ও বাল মণ্ডল। এছাড়া নিয়মিত সমীক্ষা, তথ্য সংগ্রহ ও নিবন্ধীকরণের কাজ করে এই মণ্ডলগুলি। দিল্লি ও দেশবিদেশের অনেকেই 'আশা-বন্ধু'-র হয়ে শ্রম দেন। প্রথমদিকে সরকারি-বেসরকারি আর্থিক সাহায্যকে

বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হলেও বর্তমানে আশা-বন্ধু ও মণ্ডল সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রম, চাঁদা, অনুদান এবং ঋণের ওপর বেশি নির্ভর করা হয়।

বিগত বর্ষে দিল্লির বুকে ৭১টি বস্তির প্রায় ৬ লক্ষ বাসিন্দা 'আশা ইন্ডিয়া'-র আওতায় এসেছেন। প্রতিটি আশা-বস্তিতেই রয়েছে নিজস্ব মহিলা, যুব ও বাল মণ্ডল। বস্তিবাসীদের রেশন কার্ড ও অন্যান্য

চিত্র ৪. স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রসারে আশা কম্যুনিটি হেল্‌থ ভলান্টিয়ার।
(asha-india.org/gallery/healthcare)

আইডেন্টিটি জোগাড়, স্কুলে ভর্তি, ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রয়োজনে কেবল ২০০৯-১০-এ আশা মহিলা মণ্ডলগুলি ৪৪৪ বার বিভিন্ন দপ্তরে তদ্বির-তদারকির জন্য হাজিরা দিয়েছে। প্রায় প্রত্যেকেরই রেশন কার্ড আছে। ২০১০-এ আশা-বস্তিগুলিতে শিশুমৃত্যুর হার কমে হয়েছে হাজারে ১৮। ডায়ারিয়া ও অপুষ্টিতে শিশুমৃত্যু নেই। শিশুদের লিঙ্গ অনুপাত হাজার পুত্রসন্তান পিছু ৯৫৬টি কন্যা, যেখানে সমগ্র দিল্লিতে এই অনুপাত ৮৬৬। বর্তমানে ১০০% গর্ভবতী প্রাক-প্রসব পর্যবেক্ষণে থাকেন, প্রতিষ্ঠানে বা প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর সহায়তায় জন্মদান করেন ও সাথে সাথে শিশুদের স্তন্যদান করান। আশা-বস্তিগুলির ১০০% শিশু প্রাথমিক স্তরে পড়ছে, ৮০% স্কুলে পড়া সম্পূর্ণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পড়ছে ১৭০০ জন ছাত্রছাত্রী। বয়স্কদের ৯০%-এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে, ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধের হার ৯৫%। (*আশা অ্যানুয়াল রিপোর্ট*, ২০১৬-১৭)।

৯০-এর দশকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় 'আশা' মডেলের গ্রহণযোগ্যতা স্বীকার করে এবং ২০০২-তে ডা. কিরণ মার্টিনকে পদ্মশ্রী সম্মান প্রদান করা হয়। কিন্তু তার পরেও কমনওয়েলথ গেমস প্রস্তুতির জন্য একটি 'আশাবস্তি' ২৪ ঘণ্টার নোটিশে ভেঙে, গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। যদিও 'আশা মহিলা মণ্ডল' একগুঁয়ে জিদ নিয়ে আদায় করে পুনর্বাসনের জায়গা; তারপর একে একে পাকা রাস্তা, শৌচালয়, জলের ব্যবস্থা। 'আশা'র কার্যক্রম পায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, *ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান সেটলমেন্ট প্রোগ্রাম* (*ইউ এন-হ্যাবিট্যাট*)-এর তরফে সুস্থায়ী উন্নয়নের সেরা অনুশীলন (*বেস্ট প্র্যাকটিস*)পুরস্কার।

অসরকারি সংগঠন '*ওয়াটার এড ইন্ডিয়া*' রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ২০০৮ থেকে 'স্বচ্ছ-দিল্লি, স্বাস্থ্য-দিল্লি' নামে ইউনিসেফ-এর '*ওয়াশ*' (জল, শৌচালয় ও স্বাস্থ্যবিধি) কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মহিলাদের নেতৃত্বে রেখে ২০১৫-র মধ্যে এঁরা দিল্লির বিভিন্ন বস্তিতে প্রায় ৫৪ হাজার মানুষকে পরিশ্রুত জল এবং ৩৪ হাজার জনকে শৌচালয়ের আওতায় আনতে পেরেছেন। ১৯৮০ থেকে নিজামুদ্দীন বস্তিতে জনস্বাস্থ্য, শিশুশিক্ষা ও মহিলাদের স্বনির্ভরতা প্রদানে ব্রতী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা '*হোপ প্রজেক্ট*'। যে বস্তির যথেষ্ট সংখ্যক পুরুষ নেশাগ্রস্ত, মহিলারা পরিত্যক্ত, শিশুরা শৈশবহীন, পেশা বলতে দিনমজুরি, ময়লা কুড়ানো, ভিক্ষাবৃত্তি বা গৃহপরিচারিকার কাজ, সেখানে হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান রানি বা ভবঘুরে ওয়াহিদা '*হোপ প্রজেক্ট*'-এর সাহায্যে বিদ্যালয় পর্ব শেষে শিশুশিক্ষণে প্রশিক্ষণরত (সুদেষ্ণা চ্যাটার্জী, ২০১২)। জঞ্জাল-সংগ্রাহক সন্তানদের মূলধারার শিক্ষায় সংযুক্ত করতে ও পেশাগত পুনর্বাসন দিতে ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে ১৯৯৯ থেকে 'চিন্তন' গোষ্ঠী ও ২০০১ থেকে 'চেতনালয়' সংগঠন। উপরন্তু '*চিন্তন*' গোষ্ঠী জঞ্জালসহ পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় ও জঞ্জাল নবীকরণ কেন্দ্র নির্মাণ পরিকল্পনায় পৌর প্রশাসনকে সহযোগিতা করা, এই কাজে জঞ্জাল-কুড়ানিদের শামিল করা এবং তাদের পেশাকে যথাযথ সুরক্ষাসহ বিধিবদ্ধ করার প্রয়াস রাখছে।

শিশু অধিকার রক্ষায় উদ্যোগী '*বচপন বাঁচাও আন্দোলন*'-এর কথা আমরা জেনেছি। অপর একটি অসরকারি সংগঠন '*চেতনা*' (*চাইল্ডহুড এনহ্যান্সমেন্ট থ্রু ট্রেনিং অ্যান্ড অ্যাকশন*) ২০০২ সালে দিল্লিতে গড়ে তোলে শিশুশ্রমিক ও পথশিশুদের একটি ফেডারেশন, '*বড়তে কদম*'। পরের বছর '*বড়তে কদম*' প্রকাশ করে নিজস্ব খবরের কাগজ, চারপাতার সচিত্র ত্রৈমাসিক '*বালকনামা*', যার সংবাদ সংগ্রাহক, সাংবাদিক, সম্পাদক তারা নিজেরাই। এজন্য পুরোদমে চলে সদস্যদের লেখাপড়া শেখার ক্লাস। বর্তমানে '*বড়তে কদম*'-এর সদস্য ১০০০ জন, যারা '*বালকনামা*'-র জন্যে সবসময় খবর জোগান দিয়ে চলেছে। ওদের কথায়, 'শীতকালে বড়ো কাগজে যখন লেখে কীভাবে ঘর গরম রাখবে, আমরা সেখানে লিখি শীতের রাতে কোথায় থাকতে পাওয়া যাবে'। '*বালকনামা*' এখন আটপাতার নিয়মিত মাসিকপত্র, উত্তর ভারতের আরও সাতটি শহরে যার শাখা ছড়িয়ে রয়েছে। প্রচারসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। সদস্যরা তো বটেই, সবধরনের মানুষই এর পাঠক, যাঁদের অনেকে প্রায়ই অনুদান পাঠিয়ে থাকেন। সরকারি আমলারাও নিয়মিত নজরে রাখেন কাগজটিকে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক সমাজ গবেষক, একটি নগরোন্নয়ন সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনাবিদ।

চিঠি

মাননীয় সম্পাদক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

১. *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* ৩৯তম (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৮) সংখ্যায় প্রচ্ছদ ভাবনা খুবই ভালো। প্রচ্ছদ শিল্পীর কাজ তারিফযোগ্য।

২. ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্তের 'তালা চাবির গপ্পো' খুব ভালো হয়েছে বললে কম বলা হয়। এরকম একটা ভাবনাও যে গল্পের বিষয়বস্তু হতে পারে ভাবতেও পারিনি। ডা. সেনগুপ্তের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা ছিল। তিনি উত্তরবঙ্গের একটা সরকারি হাসপাতালে কাজ করেন লিখেছেন, মনে হয় 'উত্তরবঙ্গের' কথাটা বাদ দিলেই হয়।

৩. ডা. কৌশিক দত্ত, ডা. ঐন্দ্রিল ভৌমিক, ডা. পার্থপ্রতিম পালের লেখাগুলি সময়োপযোগী এবং বেশ ভালো। আরও অনেক ভালো ভালো বিশেষণ দেওয়া যেত, কিন্তু এখন মনে আসছে না। ডা. কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের লেখাটি ভীষণ ভালো। লেখাটা প্রত্যেক নার্সিং হোমে ও প্রাইভেট হাসপাতালে দেওয়া দরকার।

৪. সৌম্য সেনগুপ্ত-র লেখাটা আরও একটু পরিষ্কার ও সবিস্তারে হলে ভালো হত। মাঝেমধ্যে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে পত্রিকা দেখে হেমলিক ম্যানুভার ঠিকঠাক করে দেখাতে পারব কিনা সন্দেহ আছে। ছবিগুলো এমন হলে কেমন হত—ক. গলায় কোনো কিছু আটকে গেলে (ছবি) → এই চিহ্ন দেখান। খ. নিজের হলে (ছবি)-র মতো করুন। সঙ্গে অবশ্যই লিখে দিতে হবে—পেট বা বুক চেয়ারের পেছনে লাগিয়ে জোরে চাপ দিন (জীগর উপাধ্যায় যেভাবে করেছেন, সেটা সৌম্য লিখেছেন ঠিকই, কিন্তু সেটা ক-জনের আর কাজে আসবে? ক-জন এটা পড়ে আবার ইউটিউব দেখবেন? গ. একদম ছোটো বাচ্চাদের হলে কী কী করতে হবে (চিত্র), তারপর বুঝিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ ছবি ও লেখা একসাথে থাকবে। অনেক আগের সংখ্যায় কার্ডিয়ো-পালমোনারি রিসাসিটেশন-এর লেখায় যেমন হয়েছিল ঠিক সেইরকম। হেমলিক ম্যানুভার বিষয়বস্তু হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। শুধুমাত্র ছবিসহ ব্যাখা দিয়ে সম্ভব হলে পুনর্মুদ্রণ করুন।

আশিস সাহা
বিজ্ঞান কর্মী
নবদ্বীপ
১১.২.২০১৮

মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প

নাসীরুদ্দীন এক সরকারি হাসপাতালের বাইরে ডাক্তারকে পেটাচ্ছে। তাই দেখে এক পড়শী জিগ্যেস করলে, "ও মোল্লা সাহেব, কী হয়েছে?"
"আমার রুগীকে ভর্তি নিচ্ছে না," বললে নাসীরুদ্দীন।
তাই শুনে লোকটিও এসে ডাক্তারকে মারতে লাগল। কিছুক্ষণ মারার পর সে জিগ্যেস করলে, "ঠিক কেন নিচ্ছে না বলতে পারেন?"
"রুগীকে বাঁচাতে ICU লাগবে। সেটা এই হাসপাতালে নেই," বলে উঠলে নাসীরুদ্দীন।
"সে কি! তাহলে ডাক্তারকে মারছেন কেন?"
"যারা ভোটের আগে বিনা পয়সায় সব চিকিৎসা প্রতিজ্ঞা করে পরে উন্নয়নের টাকা হাপিস করেছে, তাদের ঘিরে রয়েছে প্রচুর কেষ্টবিষ্টুরা," বললে নাসীরুদ্দীন। "যাকে মারবার সুবিধে তাকেই তো মারব!"